# ইচ্ছামতী

বর্ষা সংখ্যা ২০১০

# সূচীপত্র

প্রথম পাতাঃ বর্ষা সংখ্যা ২০১০ ..... 1

বর্ষার চিঠি ..... 3

ছড়া-কবিতা ..... 7

- আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ..... 7
- ব্যাং বুড়ির গপ্পো ..... 8
- বাঁচি ছেড়ে হাঁফ ..... 9

গল্প-স্বল্প ..... 10

- ভূতুড়ে উপাখ্যান ..... 10
- ডিটেক্টিভ ..... 13

বড় গল্প: কাঠের ঘোড়া ..... 20

ইচ্ছে মতন: আমার গরমের ছুটি ..... 35

বিদেশী রূপকথা: মোমোতারো ..... 37

আনমনে: আমার ছোট্টবেলাঃপর্ব ৮ ..... 40

মনের মানুষ: সুকুমার রায় ..... 49

পড়ে পাওয়া: চীনে-পটকা ..... 51

দেশে-বিদেশে: সবরমতীর সাধুর আশ্রমে ..... 52

ছবির খবর ..... 57

- মাল্লী ..... 57
- সকুট/দ্য সাইলেন্স ..... 62

বায়োস্কোপের বারোকথা: ভারতে এল সিনেমা ..... 65

পরশমণি: কেন 'বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল' ..... 71

কমিক্স্ কাহিনী: দস্যি ডেনিস ..... 77

এক্কা-দোক্কা: বিশ্বকাপ ২০১০ ..... 80

আঁকিবুকি ..... 87

# প্রথম পাতাঃ বর্ষা সংখ্যা ২০১০

দক্ষিণের আকাশে মেঘ করেছে। ভাবি বুঝি বৃষ্টি আসবে। কিন্তু খানিক পরেই দেখি -কোথায় মেঘ! আকাশ পরিষ্কার, মেঘ সৈন্যরা আমার আকাশ ছেড়ে না জানি কোথায় চলে গেছে...ঝকঝক করছে রোদ, নীল আকাশ...বর্ষাকাল না কি গ্রীষ্মকাল, নাকি আগেভাগে চলে এল শরতকাল, বোঝাই দায়! আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন বইতে পড়েছিলাম -'বৈশাখ-জৈষ্ঠ গ্রীষ্মকাল- আষাঢ়- শ্রাবন বর্ষাকাল'...এইভাবে সারা বছরের দুটো করে মাস, একটা করে ঋতুর জন্য ধরে রাখা; কিন্তু গত বেশ কয়েক বছর ধরে দেখি, আগের মত নিয়ম মেনে ঋতু পরিবর্তন আর হয়না। তাই আজকাল আষাঢ় মাসের বৃষ্টি যেন আসি আসি করেও আসে না, আর ওদিকে ভাদ্র মাসের প্রবল বৃষ্টি হয়; সেই বর্ষা পিছোতে পিছোতে আশ্বিন মাসে দুর্গা পুজো অবধিও গড়াতে থাকে...

যাকগে, পুজোর কথা পরে হবে। এখন তো আমরা বর্ষাকাল নিয়েই ভাবি! বৃষ্টি কম পড়ুক বা বেশি, বর্ষাকালের কিন্তু একটা নিজস্ব আনন্দ আছে, তাই না? কোন দিন ঘুম থেকে উঠেই দেখলে আকাশের মুখ থমথমে, ঝিরঝির করে ঝরেই চলেছে একঘেয়ে, ঠিক যেন মনে হচ্ছে মায়ের কাছে খুব বকুনি খেয়ে মন মেজাজ গরম; আবার কখনও, বলা নেই কওয়া নেই, হটাত করে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামলো দুপুরবেলা, যেন পাশের বাড়ির দুষ্টু বন্ধুটা হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে খেলতে যেতে ডাকাডাকি করছে; আবার কখনও বা মেঘ কেটে গিয়ে দেখা যায় পরিষ্কার ঝকঝকে নীল আকাশ...সেই আকাশে ভাসতে থাকে দু-চারটে সাদা মেঘ...কয়েকটা বা ধূসর...

তোমার বর্ষাকাল কেমন কাটছে? তোমার বাড়ির ছাতের ওপরে আকাশটা কি আজকে থমথমে মুখে বসে আছে? নাকি শুরু হয়ে গেছে ঝমঝমে বৃষ্টি? খবরের কাগজ দিয়ে নৌকা বানিয়ে ভাসিয়েছ রাস্তার ধারে জমে থাকা জলে? আর এই সে সেদিন হয়ে গেল রথযাত্রা, সেদিন কি ফুল দিয়ে সাজিয়ে টেনেছিলে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার রথ? পাঁপড়ভাজা খেয়েছ কি রথের দিনে? রথযাত্রা -জন্মাষ্টমী- বাইশে শ্রাবণ, রাখী পূর্নিমা- ঝুলনযাত্রা - বর্ষাকালে কিন্তু উতসবের অভাব নেই। বর্ষা মানেই কিন্তু জলকাদা ভরা রাস্তা নয়, কদম-কামিনী-যুঁই- মাধবীলতা-চাঁপা-গন্ধরাজ-- বর্ষাকালেই কিন্তু যত সুগন্ধী ফুলেদের আসা যাওয়া। আর আছে মেঘলা দিনে মায়ের হাতের গরম খিচুড়ি আর ইলিশমাছ ভাজা।

এবছর আমরা আরেকটা দারুণ জমাটি অনুষ্ঠান দেখতে পেলাম- বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা। এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর বসেছিল দক্ষিণ আফ্রিকাতে। সেই জমজমাট প্রতিযোগিতায় শেষ অবধি ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, জার্মানির মত জনপ্রিয় দেশগুলিকে হারিয়ে এবারের কাপ জিতে নিল স্পেন। আর এইসব খেলায় রোজ কোন দল জিতবে, সেইটা আগে থেকেই ইশারা করছিল কে? -অক্টোপাস পল!! ভাবো একবার!

এদিকে সাদা-ধূসর মেঘে ঢাকা মাঠ-ঘাট পেরিয়ে, রং-বেরঙা রথে চেপে, কখনো বা রঙিন কাগজের নৌকায় ভাসতে ভাসতে এসে গেল ইচ্ছামতীর নতুন বর্ষা সংখ্যা। এই সংখ্যায় আছে চীনা লোককথা অবলম্বনে একটা বড়সড় রূপকথা, একটা বর্ষাকাল জমিয়ে দেওয়া ভূতুড়ে গল্প আর একটা গোয়েন্দা-গল্প। আছে সদ্য শেষ হওয়া বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে নানারকম তথ্য ভরা এক প্রতিবেদন। আর অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ গুলি তো আছেই। আর আছে বেশ কয়েকজন নতুন বন্ধুর পাঠানো ছবি। আর হ্যাঁ, এবারে, ইচ্ছামতীর বন্ধু মধুরিমা 'ইচ্ছেমতন' বিভাগে লিখে জানিয়েছে তার গরমের ছুটি কেমন কেটেছে। তুমিও কিন্তু পাঠাতে পারো তোমার 'ইচ্ছে মতন' লেখা, ইচ্ছামতীর কাছে। কিভাবে পাঠাবে, জানতে হলে পড়ে দেখ আমাদের 'লেখা পাঠাও' পাতাটি।

এইবার তাহলে আমি চলি। তুমি বসে পড় এক ঠোঙা ঝালমুড়ি নিয়ে, ইচ্ছামতীর সাথে জমে উঠুক তোমার টাপুর টুপুর দিন রাত্তির।
ভালো থেকো।

চাঁদের বুড়ি
২৩শে শ্রাবণ, ১৪১৭
৯ই অগস্ট, ২০১০

# বর্ষার চিঠি

জানো তো এবারে বৃষ্টি খুব কম।

বর্ষাকালেও মেঘের মুখ যে রকম ভার হবার কথা এবার ঠিক তেমনটা নয়।

তুমি ভাবছো, সে আবার কি, ওমা... এই তো কয়েকদিন আগে বেশ বৃষ্টি হলো।

হল ঠিকই, কিন্তু বর্ষাকালে যেমন হয় ঠিক তেমনটা নয়।

এতদূর শুনে লকা আমাকে বললো, “তুমি ঠিক কথা বলেছো বটে। চলো আজ আমাদের গ্রামে বৃষ্টি পুজো। তুমি দেখবে আর ফটোক তুলবে।”

আমি লকার পিছন পিছন চললাম।

লকা যে গ্রামে থাকে সেটা শহর থেকে দূরে। লকা যে স্কুলে পড়ে সেটা তার গ্রাম থেকে কাছে নয়। অনেকটা পথ হেঁটে লকা স্কুলে যায়। লকা স্কুলে মন দিয়ে পড়াশুনো করে, মাদল বাজায় আর চমতকার ফুটবল খেলে। বাবার সাথে মাঠে কাজ করে, বোনকে পড়া শেখায় আর যারা স্কুলে যেতে চায়না লকা ধরে বেঁধে স্কুলে নিয়ে যায়। লকাকে সবাই ভালোবাসে, আর লকা দুষ্টুমিও করে। বন্ধুদের সাথে খেলার পরে মাঠ থেকে ইঁদুর ধরে। তারপর সেই ইঁদুর পুড়িয়ে তার মাংসের ফিস্ট হয়। আমাকেও একবার নেমতন্ন করেছিলো। সেই সন্ধ্যায়, মাঠের মাঝে চুপটি করে আগুনের সামনে বসে ইঁদুর পোড়া খাওয়া...আমার মনে থাকবে চিরদিন।

লকা হেমব্রম। চতুর্থ শ্রেনী। গ্রাম লতাবুনী। জেলা বীরভূম।

বেশ কিছু লোক রাস্তার মাঝে গোল হয়ে ঘিরে বসে কি যেন একটা করছে। কাছে গিয়ে দেখলাম পুজো হচ্ছে।

পুজো করছেন 'নাইকিয়ারাম'(পুরোহিত)। দেখলাম, ঘট, আমের পাতা, ধূপ। লকা বললো, ফটোক তোলো। গ্রামের মঙ্গলের জন্য, বৃষ্টির জন্য পুজো। আমি ছবি তুললাম।

গতবছর গিয়েছিলাম উত্তরবঙ্গে রাভাদের গ্রাম, চারিদিকে জঙ্গল, ময়ূর। এবারে লালমাটির দেশ বীরভূম। এবারে আদিবাসী সাঁওতাল গ্রাম।

ফিরে আসছি, বৃষ্টি শুরু হল...টিপ...টিপ...টিপ...

আমাদের গাড়ির উইন্ড স্ক্রিনে জলের ফোঁটা। বন্ধু ক্যামেরাম্যান তার দামী ভিডিও ক্যামেরাতে ছবি

তুলতে লাগলো।

আর আমার কানে যেন ভেসে এলো ধামসা আর মাদলের শব্দ। আমি দেখলাম তীর আর ধনুক নিয়ে লকাদের গ্রামে উতসব শুরু হয়েছে। বৃষ্টির উতসব।

unicef
unic

সবাই আবার মাঠে গেছে...সবাই আবার ধান রুইছে...।

কিন্তু না...সত্যি তেমনটা হয়নি...এবারে বৃষ্টি কম। এবারে অনেকেই ধান রুইতে পারেনি। লকার বাবাও নয়।

মনে মনে বলি আয় বৃষ্টি ঝেঁপে...

তুমিও আমার সাথে বলো। আর পাড়ায় কিম্বা বাড়ির টবে, ছাদে কিম্বা বারান্দায় একটা গাছ লাগাও, জল দাও...একদিন সেই গাছ সত্যি পরিমাণ মতো বৃষ্টি এনে দেবে। তখন লকার বাবা ধান রুইতে পারবে। আর আমরা শহরে বসে সেই ধানের চাল থেকে গরম গরম ভাত খাবো।

খুব ভালো থেকো। তোমার জন্য লকার গ্রামের এক দেওয়াল ময়ূর পাঠালাম। আর তার সাথে থাকলো জল থৈ থৈ অনেক অনেক ভালোবাসা।

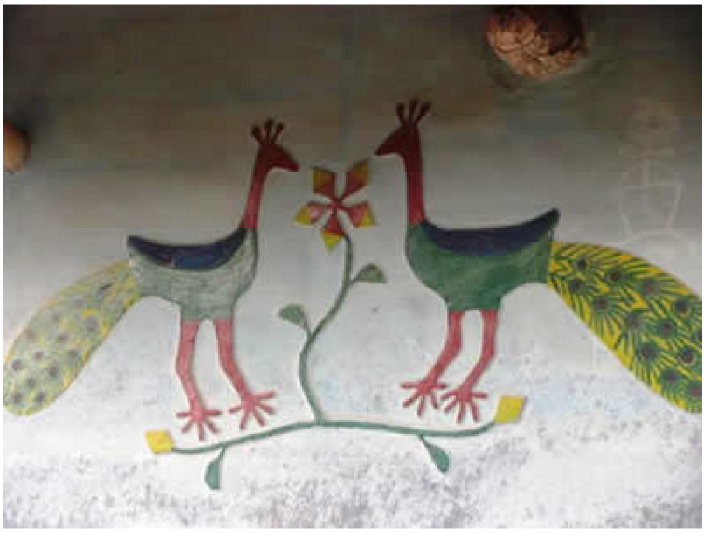

লেখা ও ছবি
কল্লোল

## ছড়া-কবিতা

# আয় বৃষ্টি ঝেঁপে

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
মেঘের মুঠোয় জলের কণা
ধর না রে তুই চেপে ;
পূবের হাওয়ায় লাগল দোলা
উঠল পাতা কেঁপে।

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
মেঘমুঠিতে বাষ্পকণা
দিসনা যেন মেপে ;
ধানক্ষেত তার সবুজ নিয়ে
উঠুক ফুলে ফেঁপে ।

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
মেঘের ভেলায় ভেসে ভেসে
ধরার বুকে সঁপে ;
নীল আকাশের রং লুকিয়ে
উঠুক আকাশ ক্ষেপে ।

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
মেঘবুকেতে এঁকে বেঁকে
রংতুলিতে ছেপে ;
বৃষ্টি আমার বর্ষামায়ের
কোল আলো কর রূপে ।

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
মেঘবাড়ীর ঐ জলশাড়ি পর
হাওয়া-নূপুর সন্ধ্যে-দুপুর
রিমঝিম গান টুপুর-টাপুর
বর্ষামায়ের মেয়েগুলো সব
আয় না তোরা ঝেঁপে ।

ইন্দিরা মুখার্জি
কলকাতা

# ব্যাং বুড়ির গপ্পো

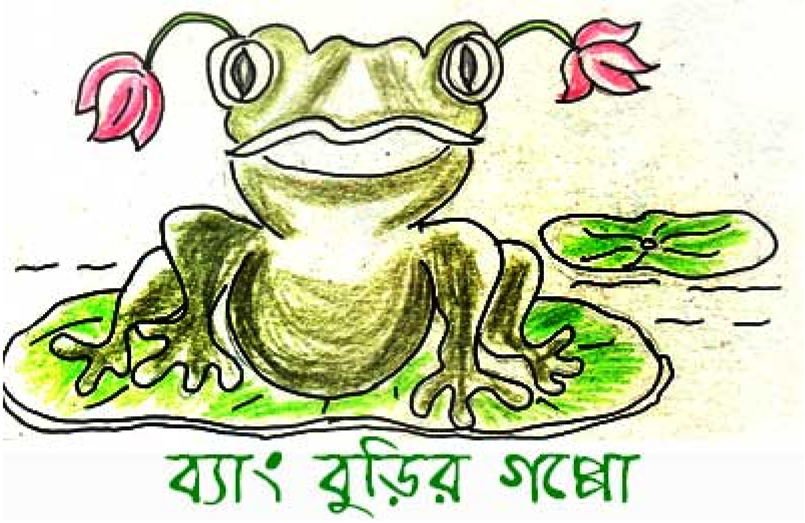

ব্যাঙ বুড়ি গো ব্যাঙ বুড়ি
গল্প তুমি জানো?
রাজকন্যা রাজপুত্তুর
আর দত্যি-দানো

ফোকলা হেসে বললে বুড়ি
-জানি,জানি,জানি,
লালকমল নীলকমল
আর রাক্ষসী-রানি

এই না বলে হাই তুলে সে
চোখটি দিল বুজে;
দুই কানে দুই পদ্ম ডাঁটি
আপনি দিল গুঁজে

আমি বললাম গল্প বল
ঘুমিয়ে গেলে নাকি?
বলল তেড়ে দুর হয়ে যা
খালি পড়ায় ফাঁকি।

দ্বৈতা গোস্বামী
গুরগাঁও, হরিয়ানা

# বাঁচি ছেড়ে হাঁফ

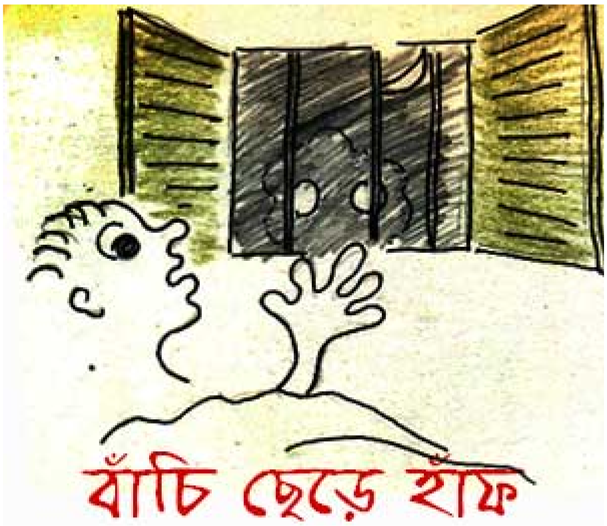

কালকে রাতে ঘুম ভেঙেছে হঠাৎ কিসের ডাকে
তাকিয়ে দেখি দাঁড়িয়ে কে যে দুই গরাদের ফাঁকে
ড্যাবড্যাবিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে চোখ
ভেবেছিলাম হয়তো বুঝি অচেনা এক লোক।
লোকটা কোথা? দাঁড়িয়ে সেথা একটা পাজি শেয়াল
যেই ভেবেছি তাড়িয়ে দেব হঠাৎ এলো খেয়াল
লাঠি কোথায়? তাড়াই কিসে? রাত যে এখন দুপুর!
দুচোখ মুছে তাকিয়ে দেখি আমার পোষা কুকুর
দুইপা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সজল করুণ চোখে
ভাবছি যখন দরজা খুলে জড়িয়ে ধরি বুকে
আস্ত কুকুর মেকুর হয়ে বাইরে দিল লাফ
স্বস্তিতে শ্বাস ফেলে তখন বাঁচি ছেড়ে হাঁফ।

জামাল ভড়
বারাসাত, উত্তর চব্বিশ পরগনা

## গল্প-স্বল্প

# ভূতুড়ে উপাখ্যান

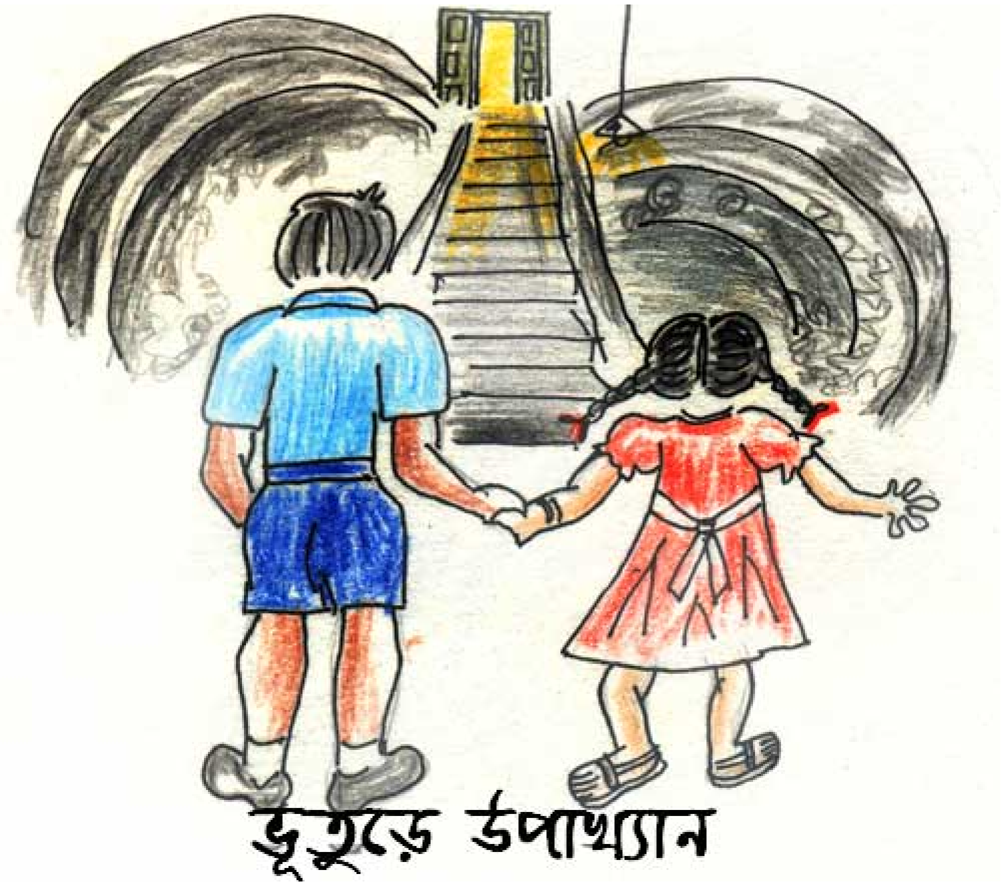

ভুতো আর নমি দুই ভাইবোন। ভুতো বড় নমির থেকে, দু মিনিটের। নমি তাই অন্ধের মতো ভুতোর সব কথা বিশ্বাস করে। ভুতো খেলাধুলোর যা যা উপায় বাতলায় নমি বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়। শুধু সন্ধেবেলা নমিকে দোতলায় যেতে বললে কিছুতেই নমি যেতে পারেনা।

একটা সময় ছিল যখন নমিকে হাত ধরে ভুতো পাড় করে দিত ল্যাণ্ডিংটা। পুরোটাই নমি চোখ বন্ধ করে পার হতো। আর দেখতে পেত গাঢ় অন্ধকারে সাদা সাদা গোল গোল বলের মতো চোখ সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনো মুখ নেই চোখের চারপাশে; কিন্তু শনের নুটির মতো সাদা চুল আছে, চোখের পিছনে একটু দূরে।

পরের দিকে আলো জ্বালা থাকলে ল্যাণ্ডিং-এ, নমি পার হতো জায়গাটা একছুটে। তবে সিঁড়ির নিচে আম্মা আর দোতলায় সিঁড়ির মুখে দাদাই দাঁড়িয়ে থাকলে তবেই নমি সাহস করে পার হতো ল্যাণ্ডিংটা। তারপর একদিন লক্ষ্মী পিসি মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে ছিল, “ভুত আমার পুত/ পেত্নি আমার ঝি/ রামলক্ষ্মণ বুকে আছে/ ভয়টা আমার কী?” তারপর থেকে মন্ত্র জপে পার হতো নমি জায়গাটা। কিন্তু তা স্বত্বেও নমি বেশ দেখতে পেত সাদা আঙুলগুলো কাতুকুতুর ভঙ্গিমায় এগিয়ে আসছে ওর দিকে। কিন্তু বোধহয় ও মন্ত্র জপে বলেই ভুতের আঙুল ওর গায়ে আঁচড়টি লাগাতে পারে না। কিন্তু একদিন চোখ বন্ধ করে

মন্ত্র জপতে জপতে জায়গাটা পেরোনোর সময় ও শুনেছিল অট্টহাসির শব্দ। তার সঙ্গে দেখতেও পেয়েছিল হাওয়ায় ভাসতে থাকা দাঁতের পাটিজোড়া। বেচারা সেই থেকে সন্ধেবেলা আর দোতলায় যেতেই পারে না।

এদিকে একতলায় মা-বাবা, আম্মার চোখের সামনে যা খুশি তাই পরীক্ষা করা যায় না। কিন্তু পরীক্ষা করুক আর নতুন খেলা খেলুক, ভুতোর একটা শাগরেদ কিংবা খেলার সাথী লাগে। নমি দোতলায় না যাওয়ায় ভুতোর সন্ধেটাই মাঠে মারা যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

তবে আজকাল আর ওদের অত অসুবিধে হচ্ছে না। টিভিতে গত তিনমাস ধরে ভুত-ভুতুম অনুষ্ঠান চলছে। রোজ রাত নটায়। এরমধ্যে পৃথিবীর নানাদেশের ভুতুড়ে-অদ্ভুতুড়ে সব ঘটনা নিয়ে ওরা অনেকগুলো ছোট ছোট নাটক দেখে ফেলেছে। তারপর এলেন বটকৃষ্ট মাইতি নামে একজন বিশিষ্ট ভুতবাদী। সেই অনুষ্ঠানেই তাঁর বিপক্ষে তথ্য-যুক্তি দিয়ে ভুত নেই প্রমাণ করার জন্য উপস্থিত ছিলেন ভুতবিরোধী আন্দোলনের নেতা যুধাজিৎ দত্ত। এইসব যুক্তি তর্ক শুনে ভুতো নমির সাথে খুব ঝগড়া করল এই নিয়ে যে ভুত বলে আসলে কিছু হয় না। নমি কিন্তু জবাবে কেবলই বলেছে যে ও ভুত দেখেছে তাই বিশ্বাস করে যে ভুত আছে। ভুতোও ছাড়বে না। সে সমানে বলে চলেছে ভুতকে দেখাই যায় না।

দুজনের চেঁচামিচিতে অস্থির হয়ে মা বললেন যে কোন ভুত বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বললেই হবে। তারপর বেশ কয়েকদিন ভুত বিশেষজ্ঞ কে কোথায় থাকেন তার খবর যোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দুজনে। শেষ অবধি মা-ই উপায় করে দিলেন। ভুত-ভুতুমের ফোন-ইনে প্রশ্ন করে জেনে নিতে যে ভাইবোনের মধ্যে কে ঠিক বলছে।

ফোন-ইন অনুষ্ঠানে এলেন ভুতবাদী ঘন্টেশ্বর ঘড়ুই। আবার তাঁর মোকাবিলা করতে ভুতবিরোধী মন্টু মাকড়। সন্ধে থেকে বেদম চেষ্টার পর যা হোক লাইন পাওয়া গেল। ভুতো হাঁসফাঁস করে জিজ্ঞেস করে বসল, “আচ্ছা কাকু সত্যি কি ভুত আছে?” মন্টু মাকড় আগে উত্তর দিলেন, “না নেই”। শুনেই নমি ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, “কিন্তু আমি যে দেখেছি!” তখন ঘন্টেশ্বর ঘড়ুই বললেন “কোথায় দেখেছ তুমি ভুত?” উত্তরটা কেড়ে নিয়ে ভুতো তড়বড় করে বলল, “ ও নাকি সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ ভুত দেখে রোজ, কিন্তু ঐ জায়গাটা ও চোখ বন্ধ করে পেরোয় যে, তাহলে ও কী করে ভুত দেখেবে?” এটা শুনে নমির ঠোঁট আরও ফুলে উঠল। কিন্তু ঘড়ুই আর মাকড় দুজনেই খানিক ভেবে নিয়ে বললেন যে ভুতো নমিকে নিয়ে যেন দুপুর বেলা সেই সব জায়গায় যায় যেসব জায়গায় সাধারণতঃ ভুতের বাসা হয়। কারণ কথায় বলে “ঠিক দুক্কুর বেলা/ ভুতে মারে ঢ্যালা”। তাহলে ভুতের বাসায় দুপুরবেলা উঁকি মারতে গেলে ভুত নিশ্চয়ই খুশি হবে না এবং ঢ্যালা মেরে তাড়াবে ভাইবোনকে। সুতরাং ঢ্যালা খেলেই প্রমাণ পাওয়া যাবে যে ভুত আছে।

কথামতো দুপুরে বনে যাওয়ার জন্য দুভাইবোনই অপেক্ষায় রইল গরমের ছুটির। যেই ছুটি পড়ল অমনি দুজনে গেল পিসিমণির গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে। সেখানে হারাবার ভয় নেই, গাড়ি চাপা পড়ার ভয় কম, ছেলে ধরার ভয় নেই, সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং নেই, তাই ভুতের ভয়ও নেই। তাই সারাদিন যা খুশি করার মানাও নেই।

সেখানে পর পর কয়েকটা দুপুর দুজনে তালতলা, বেলতলা, শ্যাওড়াওতলা, ফলসা বনে এন্তার ঘুরে

বেড়াল। খুব হট্টগোল করল। কিন্তু ভুতে কেন কেউই ওদের ঢ্যালা মারল না। ভুতো খুশি হলো। নমিও খুশি হলো। ভুতো খুশি হলো ভুত নেই প্রমাণ হয়ে গেল বলে; নমি খুশি হলো ভয়ানক ভুতের সাথে দেখা হলো না বলে; দেখা হলে তো পিসিমণির বাড়িতে ছুটির আনন্দটাই মাটি হয়ে যেত। কিন্তু ভুতোকে ভুত দেখাতে না পারার একটা মন কেমন ঘিরে রইল নমিকে বাড়ি ফেরা অবধি।

বাড়ি ফিরল ওরা একদিন সন্ধের মুখে মুখে। তখন সবে সিড়িঁর ল্যাণ্ডিং-এ থোপা থোপা ছাই রঙে অন্ধকার জমা হচ্ছে একটু একটু করে। দৌড়ে নমি পৌঁছে গেল সেখানটায়। চোখ বন্ধ করে দেখতে পেল হাওয়ায় ভাসছে গোল বলের মতো চোখেরা, শন নুটির মতো চুলেরা, মাড়িসুদ্ধ দাঁতের পাটিরা আর কিলবিলিয়ে আসছে আঙুলরা। ভয়ে, খুশিতে, চীৎকার করে উঠল নমি, “এই তো আছে সব এখানেই!”

ছাতিম ঢ্যাং

# ডিটেক্টিভ

১

খেলার মাঠে পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে বসেছিলাম দুজনে। আমি আর পিন্টু। হাতে পায়ে ধুলো, গায়ের গেঞ্জি ঘামে জবজব করছে। তবু এক্ষুনি বাড়ি যাওয়ার কথা ভাবতে পারছিলাম না দুজনেই। ইস্কুলে গরমের ছুটি পড়ে যাচ্ছে কাল থেকে। গরমের ছুটি মানেই পড়াশুনো নেই। সারাদিন বাড়ি বসে সময় নষ্ট করলে তো আর হবে না - নতুন কিছু খেলা বের করতে হবে। কদিন আগে আবিষ্কারক হওয়ার চেষ্টা একেবারে মাঠে মারা গেছে। আমরা ডাইনোসরের হাড় ভেবে মাটি খুঁড়ে যা খুঁজে পেয়েছিলাম তা আসলে অন্য কিছু। কিন্তু তাতে উৎসাহে ভাটা পড়েনি একটুও। আমরা দুজনেই নিশ্চিত ছিলাম যে একটা কিছু উপায় হবেই। গরমের ছুটি বলে কথা।

পিন্টুই কথা বলে উঠল একসময়, 'আচ্ছা, আমরা গোয়েন্দা হলে কেমন হয়?'

'গোয়েন্দা?' আমি অবাক হয়ে ঘুরে বসলাম।

'হ্যাঁ, কেন নয়? পৃথিবীর সব দেশেই খুদে গোয়েন্দা আছে। তাদের কীর্তিকলাপের কথা কত জায়গায় লোকের মুখে মুখে ঘোরে।'

'তাই নাকি? কই আমি তো জানি না-'

'তুই জানিস না বলেই কি আর হয় না? আর বড় বড় গোয়েন্দাদের এসিটেন্ট ছোটরাই হয়।'

'আচ্ছা, তা নয় হলাম। কিন্তু তারপর'

'তারপর আমাদের রহস্যের অনুসন্ধান করতে হবে। বুদ্ধি খাটিয়ে চোর ধরতে হবে।'

আমি চোখ বড় বড় করে বললাম, 'সে কি আমরা পারব?'

পিন্টু বুক ফুলিয়ে বলল, 'কেন পারব না? নিশ্চয়ই পারব। একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আমি অনেক গোয়েন্দা গল্প পড়েছি। আমাদের সব সময় চোখকান খোলা রাখতে হবে। চারিদিকে সব খুঁটিনাটি লক্ষ্য করতে হবে। আর একটা ক্লু পেলেই ব্যস - কেল্লাফতে'

'ক্লু? সেটা আবার কি? ইস্ক্রুপ টিস্ক্রুপ নয় তো?'

'দূর, তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না। কোন বড় রহস্যের সমাধান এক একটা ছোট্ট সূত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। সাধারন মানুষের তা চোখে পড়েও পড়ে না। কিন্তু আমাদের তার মধ্যে থেকেই অপরাধীকে খুঁজে নিতে হবে।'

যেমন কথা তেমন কাজ। ফুটবল মাঠ ছেড়ে আমরা দুই খুদে গোয়েন্দা বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। আমি তখনও ঠিক ঠিক বুঝছি না আমরা কোন রহস্যের সমাধান করবো। পিন্টু আমাকে একমনে বুঝিয়ে চলেছে। আমাদের রহস্য খুঁজে নিতে হবে। একবার দু-একটা রহস্যের সমাধান করে ফেলতে পারলেই আর দেখতে হবে না। দিকে দিকে আমাদের নাম ছড়িয়ে পড়বে। আপাতত ঠিক হল পিন্টুই হবে প্রধান গোয়েন্দা, আর আমি ওর এসিস্টেন্ট। তবে আমাদের কাজ শুরু হয়ে যাবে আজ থেকেই। বাড়িতে ঢোকার সময় ছোটকাকা ধরে বলল, 'কিরে গরমের ছুটি পড়ে গেছে বলে কি পড়াশুনো শেষ হয়ে গেল নাকি? আয় তোকে একটু ইংরাজীটা দেখিয়ে দিই-'

আমি ছোটকাকাকে কিছু না বলে চুপিচুপি ঢুকে পড়লাম। পিন্টু বলেছে, গোয়েন্দাদের মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে সব সময়। এসব তো নেহাত ছোটখাট ব্যাপার।

২

হাত পা মুখ ধুয়ে একটু পড়তে বসলাম। না বসলে মা রাগ করবে। বাবাকেও বলে দিতে পারে। আর ওদিকে ইস্কুলে ছুটির কাজও দিয়েছে একগাদা। প্রত্যেক সাবজেক্টের জন্য হোমটাস্কের খাতা খুলে দেখতে শুরু করেছি কি কি দিয়েছে। তাড়াতাড়ি শেষ না করে ফেলতে পারলে ভাল করে গোয়েন্দাগিরি করা যাবে না।

পিন্টু বলে দিয়েছে সবদিকে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। পড়ার ঘরে আমি একা একা বসে ভাবছিলাম কি লক্ষ্য করা যায়। কোথায় খুঁজে পাওয়া যায় একটা রহস্য। অঙ্কের খাতাটা খুলে রেখেছি বটে, কিন্তু কাজ কিছুই এগোচ্ছে না। এমন সময় পাশের ঘর থেকে মার গলার আওয়াজ পেলাম। মা কাকীমার সঙ্গে কথা বলছে। অন্য সময় হলে শুনতাম না। কিন্তু আজকে বুকটা ধুকপুক করতে শুরু করল। কোথাও কিছু একটা চুরি হয়েছে মনে হচ্ছে।

পড়া মাথায় উঠল। আমি একলাফে হাজির হলাম মার কাছে। মা আর কাকিমা দুজনেই বসে ছিল সোফাতে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মা, কি চুরি হয়েছে গো?'

মা চমকে বলল, 'সে কি তোর পড়া হয়ে গেল?'

'না হয়নি। আজই তো ছুটি পড়ল। আজকে না পড়লেও হবে। তুমি বলনা, আমাদের বাড়িতে চোর এসেছিল কিনা?'

'আরে, হ্যাঁ। সেটাই তো বলছিলাম। তবে চোর এসেছিল কালকে রাতে। ঘুমোতে ঘুমোতে মনে হচ্ছিল

কেন জানিনা একটু অস্বস্তি লাগছে। তারপর আজ সকালে দেখলাম অত সুন্দর দামী এমব্রয়ডারি করা বেডকভারটা নিয়ে পালিয়েছে। ওটা ছিল আমার ঘরেই সেলাই মেশিনটার ওপরে।'

কাকীমা এতক্ষন চুপ করেছিল। এবার বলে উঠল, 'সিঁড়ির তলা থেকে তোমার কাকুর নতুন জুতোজোড়াও নিয়ে গেছে।'

আমি আরো খানিক শুনলাম। প্রথমে মনে হল কেবল চাদর আর জুতো? তারপর ভাবলাম শুরুটা না হয় ছোটখাট চুরি দিয়েই হোক। পরে বড় সুজোগ পাওয়া নিশ্চয়ই যাবে। এখনকার মত একটা রহস্য তো পাওয়া গেল। এইসব ভাবতে ভাবতে ছটফট করছিলাম। কিন্তু সেটা তো আর এক্ষুনি বলা যায় না মাকে বা কাকীমাকে। তাই সব শুনেটুনে ঘরে চলে এলাম।

এটা নিয়ে পিন্টুর সাথে এখনই আলোচনায় বসতে পারলে দারুন হত। কিন্তু এত রাতে বাড়ি থেকে বেরোনর উপায় নেই। একটা ফোন করা যেতে পারে ওদের বাড়িতে। কিন্তু ফোনটা তো আবার বাইরের ঘরে। সবাই শুনতে পেয়ে যাবে। পিন্টু বলে দিয়েছে, আমাদের কাজ করতে হবে সবার চোখের আড়ালে। কেউ যেন টেরটি না পায় আমরা চুপি চুপি গোয়েন্দা হয়ে গিয়েছি। আর তার ওপরে ছোটকাকার তো ভরসা নেই। কে জানে হয়তো সবার সামনে কান মুলে দিয়ে বলল, 'যাও এসব ছিঁচকেমো না করে পড়তে বস।'

খেতে বসেও উসখুশ করছিলাম। বাবা একবার বলল, 'কি রে কি হয়েছে তোর? শরীর-টরির খারাপ নাকি?'

আমি মাথা নেড়ে অল্প কিছু খেয়ে উঠে পড়লাম। ঠিক করলাম রাতে বিছানায় শুয়েও ঘুমোব না একেবারেই। খালি মনে হচ্ছিল এই যেন কেউ জানালার ফাঁক দিয়ে হাত গলাচ্ছে। উসখুশ করতে করতে একসময় ঘুমিয়েই পড়লাম কখন।

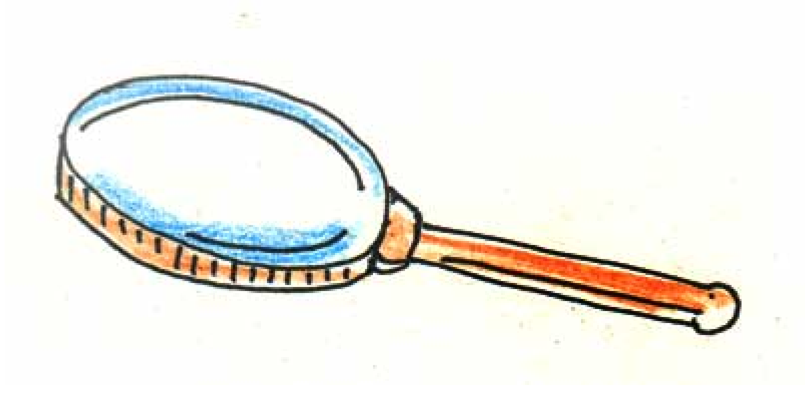

### ৩

সকালে কোনরকমে জলখাবারটা খেয়েই ছুট দিলাম আমাদের গোপন আস্তানায়। সেটা আর কোথাও নয়, আমাদের পাড়ারই একটা শেষ না হওয়া বাড়িতে। বাড়িটার ছাত ঢালাই হওয়ার পর কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। কে জানে আবার কবে শুরু হবে। তবে যতদিন না হয় ততদিনই মঙ্গল। আমাদের এই

আস্তানাটা খুব একটা জানাজানি হয়নি। গিয়ে দেখি পিন্টু ইতিমধ্যেই এসে হাজির হয়েছে। শুধু তাই ই না, একটা ছোট্ট নোটবুক নিয়ে কিসব যেন লেখালিখি করছে।

'কিরে তুই কখন এলি?'

'বেশ কিছুক্ষন। গোয়েন্দাদের ধৈর্য না ধরলে কিছু না।'

'আরে শোননা, আমার কাছে একটা দারুন খবর আছে। আমি একটা রহস্য খুঁজে পেয়েছি জানিস।'

'হুমম, ধীরে সুস্থে গুছিয়ে বল।'

'আমাদের বাড়ি থেকে চুরি হয়ে গেছে। এর আগে কখনো আমাদের বাড়িতে চোর আসেনি'

'হড়বড় করিসনি। কি চুরি হয়েছে?'

'একটা নতুন বেডকভার আর ছোটকাকার একজোড়া জুতো।'

'হুমম, বুঝেছি–'

'কি বুঝলি রে?'

'এটা পুরনো খবর'

'পুরনো খবর মানে? বললেই হল?' আমি একটু জেদ করে বললাম, 'একশবার নতুন খবর। চুরিটা হয়েছে পরশু রাত্তিরে। মা আমাকে কালকে রাত্তিরে বলেছে।'

'আরে তা বলি নি। তোদের বাড়িতে চুরি হয়েছ নতুন। কিন্তু পাড়ায় সব বাড়িতেই কিছু না কিছু চুরি হচ্ছে কয়েকদিন থেকে। বড় কিছু নয়, সবই ছোটখাট জিনিস। তাই কেউ পুলিশের কাছেও যেতে পারছে না।'

'সে তুই কি করে জানলি?'

পিন্টু একটু মুচকি হাসি হেসে বলল, 'সে অনেক কথা। গোয়েন্দা তো আর বললেই কেউ হয়ে যায় না। চারদিকে খোঁজ খবর রাখতে হয় কি হচ্ছে, কি না হচ্ছে। বুঝলি?'

আমি অবাক হলাম, 'ও তাহলে এখন উপায়? তুই কি কিছু ভেবেছিস নাকি কি করবি?'

'পাড়ার সবাই খুব সতর্ক হয়ে গেছে। ঠিক করছে রাতে কয়েকদিন পাহারাও দিতে পারে।'

'সে তো বড়রা দেবে। আমাদের কি আর সেখানে নেবে?'

'না, তা নেবে না। আমাদের নিজের মত করে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। দেখতে হবে কার ওপর সন্দেহটা বেশি হয়?'

'ধুর, চোরকে কি আমরা চিনি নাকি যে সন্দেহ করব?'

পিন্টু এবার একটু বিরক্তই হল। 'উফফ, তোকে যে আর কি কি শেখাব ভেবে পাচ্ছি না। মন দিয়ে

শোন – গোয়েন্দাগিরির নিয়ম হচ্ছে সন্দেহ করতে হবে সকলকেই। কাউকে বাদ দিলে চলবে না। অনেক ছোটখাট ঘটনার মধ্যেই ক্লুটা লুকিয়ে থাকতে পারে।'

আমার ব্যাপারটা ঠিক মনে ধরল না। তাও পিন্টু রাগ করতে পারে ভেবে আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

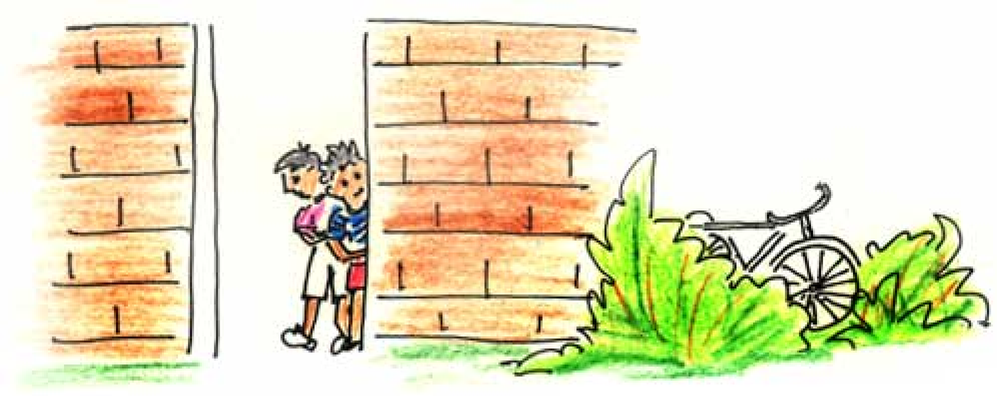

## ৪

আমাদের বিকেলের ফুটবল খেলা মাটি হল।

আজ দুপুরেই আমাদের সামনের বাড়িটা থেকে একটা সাইকেল চুরি গেছে। এরকম অবস্থায় আমাদের তো আর বসে থাকা চলে না। আমরা আবার রওনা দিলাম আমাদের আস্তানার দিকে। পিন্টুটা দেখি কানের কোনে একটা পেন্সিল গুঁজে রেখেছে। কেন কে জানে, হয়তো মাঝে মাঝে ওর ছোট্ট নোটবইতে কিছু লিখবে বলে। কিন্তু এই মুহুর্তে ওকে ছুতোর মিস্তিরির মত দেখাচ্ছে ঠিক। আমি ওর পদ্ধতির সাথে ঠিক একমত হতে পারছি না। কিন্তু একা একাও কিছু করতে পারব না ভেবে চুপচাপ দেখে যাচ্ছি।

ও আমাদের আস্তানায় পৌঁছেও কিছু করল না। চুপচাপ একটা জানলার বক্সে সিমেন্টের স্ল্যাবটার ওপরে উঠে বসে বলল, 'আমাকে আরকটু ভাবতে দে।'

আমি পায়চারি করতে করতে ভাবছিলাম যে চুরি করছে সে কি আর আমাদের পাড়ার কোন লোক হবে? তাহলে তো সে আগেও চুরি করত বা এতদিনে ধরা পড়ে যেত। আর যে চুরি করে তাকে চুরি করা জিনিস কোথাও তো নিশ্চয়ই লুকিয়ে রাখতে হয়। হয়তো নিজেকেও কোথাও না কোথাও লুকিয়ে থাকতে হতে পারে। এমন সময় ধড়মড় করে একটা আওয়াজ পেলাম। চমকে ওঠার সাথে সাথে কেন জানি না খুব ভয়ও পেয়ে গেলাম। এই সব মুহুর্তে পিন্টুকে আমার খুব দরকার। ও খাতা নামিয়ে রেখে বলল, 'টুবলু, ভয় পাসনি। নে হাত ধর।' এইভাবে আমরা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম বাড়িটার পিছনের দিকে। এখানে আমরা বড় একটা আসি না। সিঁড়ির তলায় একটু অন্ধকার ঘুপচি মত, আর তার ওপাশে সেপটিক ট্যাঙ্ক। আমরা একটু করে এগিয়ে দেখলাম একটা লোক, জড়সড় হয়ে।
পিন্টুই সাহস করে বলল, 'কে তুমি? এখানে কি করছ?'

লোকটা খনখন করে মাথা নীচু করে বলল, 'আমি চোর বাবু। আমি একটু ঘুমিয়েছিলাম এইখেনে। তোমাদের গলার শব্দে জেগে গিয়ে পালাচ্ছিলাম-'

পিন্টুর সাথে থেকে আমারও সাহসে বুক ফুলে উঠছিল। তাছাড়া লোকটা আমাদের মত দুজন ক্ষুদে গোয়েন্দাকে দেখে ভয় পাচ্ছে দেখে আরো যেন সাহস বেড়ে উঠল। বললাম, 'পালানো বের করছি তোমার। তোমাকে আমরা পুলিশে দেব।'

লোকটা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'বাবু, তোমরা কাউকে বলে দিওনি। ওরা আমাকে পুলিশে দিবেনি। পিটাইয়ে মেরে ফেলবে-'

পিন্টু বলল, 'এত ভয় তো চুরি কর কেন?'

'পেটের দায়ে বাবু। ফ্যাকটিরিতে কাজ করতাম আগে। সে কাজ বন্ধ হয়ে গেল। তারপর ছিলাম এক সেলাইয়ের দোকানে। হপ্তাখানিক আগে সেখান থেকেও তাড়ায়ে দিল-'

'তাই বলে চুরি করবে?'

'আর করবুনি বাবু। চুরি আমি কোনদিন করিনি। কি নিয়েচিই বল তোমরা বাবু। এর বাড়ি থেকে চাদর, ওর বাড়ি থেকে বাসন।'

'কেন আর আজকের সাইকেলটা?'

'ও সাইকেল নিয়ে পালাচ্ছিলাম তখন একটা কুকুর তাড়া করল বলে পুকুরের পাশে কচুবনে ফেলে এইচি। চুরির জিনিস কি করব তাই ই জানিনে বাবু। দু একটা জিনিস এই বাড়ি পড়ে রইচে। চুরি আর করবুনি। কিন্তু তুমি ধরিয়ে দিলে ওরা খুব মারবে আমায়-'

## ৫

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরীই হল আমার। কালকে প্রথম বাড়িতে না বলে আমরা এত বড় একটা কাজ করেছি। কিন্তু কালকে চোরটার কথা শুনে খুব মায়া লাগছিল।

ওকে পুলিশে দেব কি? ওই চেহারায় কি আর মার খাওয়ার জন্য আর কিছু বাকী আছে? আমি আর পিন্টু একবার চোখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলাম। আগেও দেখেছি আমাদের যতই ঝগড়া বা কথা কাটাকাটি হোক না কেন, দরকারের সময় আমরা খুব সহজেই একজন আরেকজনের মনের কথা খুব বুঝে নিতে পারি। ঠিক করলাম লোকটা যখন বলছেই চুরি আর করবে না তখন মনে হল ওর পালানর ব্যবস্থা করতে হবে আর এই ঘটনাটা বড়দের কাউকে জানান হবে না।

তবে তার আগে কিছু খাবার জোগাড় করতে হবে। ও নাকি দুওদিন কিছু খায়নি। তবে বেশিক্ষন সময় আমাদের লাগল না। বাদামভাজা ছিল আমার পকেটে। পিন্টুদের বাড়িটাও কাছেই। ও নিয়ে এল খাওয়ার জল আর একটু চকলেট। সেইসঙ্গে আমাদের জমান টাকার ফান্ড থেকে লোকটাকে কুড়িটা

টাকা দিয়ে বলল, 'অনেক চুরি করেছ। এইবেলা চুপি চুপি বিদেয় হও।'

আর আমি বললাম, 'এক মিনিট। চুরির জিনিসগুলো এখানেই রেখে যাও।'

বিছানায় শুয়েই শুনতে পেলাম বেশ হইচই হচ্ছে বাড়িতে। হওয়ারই কথা। আমাদের কাজের পিসি বাড়ির পাঁচিলের পাশে খুঁজে পেয়েছে মার বেডকভার আর কাকার জুতোটাও। অন্যান্য হারান জিনিসও এক এক করে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এখান ওখান থেকে। সাইকেলটা তো আমরা উদ্ধার করেছিলাম কালকেই।

ঘুম ভেঙে গেলেও আমার উঠতে ইচ্ছে করল না। পৃথিবীর সেরা ডিটেকটিভদেরও একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। শুয়ে শুয়ে দেখলাম জানলার ফাঁক দিয়ে রোদের ঝিকিমিকি এসে পড়ছে জানলার কোনে। বড় সুন্দর এই সকালটা।

অভ্র পাল
কারডিফ, ওয়েলস্, যুক্ত রাজ্য

# বড় গল্প: কাঠের ঘোড়া

--চীনা রূপকথা অবলম্বনে

## ১

একদিন এক কামার আর এক ছুতোরমিস্ত্রী তর্ক জুড়েছে। দুজনেরই দাবী তার হাতের কাজ সবার সেরা। যে যার নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে নানা যুক্তি দেখায়। কিছুতেই ঝগড়ার নিষ্পত্তি হয়না। শেষে তারা ঠিক করে রাজামশায়ের কাছে যাবে। রাজামশাইকেই এর সমাধান করে দিতে বলবে।

রাজামশাই প্রতাপাদিত্য ওদের দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন - তোমরা কে? এখানে কেন এসেছ?

ছুতোর বলল - মহারাজ, আমি ছুতোরমিস্ত্রী। আমার হাতের কাজ পৃথিবীর অন্য যে কোন ছুতোরমিস্ত্রীর থেকে অনেক বেশি নিখুঁত ও উন্নতমানের। কিন্তু এই কামারটা বলে কিনা তার হাতের কাজ আমার থেকেও ভালো।

কামার বলল - মহারাজ, আমার হাতের কাজ দেখে সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যায়। আমি কি করে মেনে নেব যে এই ছুতোরটার হাতের কাজ আমার থেকে ভালো? আমরা চাই আপনি পরীক্ষা করে বলে দিন আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ।

রাজামশাই পড়লেন মহা বিপদে। বললেন - আমি তোমাদের হাতের কাজ না দেখে তো কিছু যাচাই

করতে পারব না। তোমাদের দশ দিন সময় দিলাম। তার মধ্যে তোমরা কিছু জিনিস তৈরী করে এখানে নিয়ে এসো।

এই শুনে ছুতোর ও কামার যে যার বাড়ী চলে গেল। দশদিন দশরাত ধরে অনেক পরিশ্রম করে যে যার নিজের পছন্দ মতো জিনিষ বানিয়ে রাজামশাই-এর কাছে নিয়ে এলো।

রাজামশাই বললেন - কই কে কি বানিয়েছ দেখাও।

কামার দেখাল সে বানিয়েছে লোহার বিশাল এক মাছ। বলল - এই লোহার মাছটা এক লক্ষ বস্তা শষ্য পেটে নিয়ে নৌকোর মতো জলে ভেসে ভেসে যেতে পারে।

এই শুনে রাজামশাই তো মনে মনে খুব হাসলেন। ভাবলেন –কামার তো হারছেই। এই লোহার ভারী জিনিষটা জলে ফেললে নির্ঘাৎ ডুবে যাবে। তার ওপর যদি এতো শষ্য চাপানো হয় তো আর কথাই নেই। ভেসে থাকা অসম্ভব। কিন্তু কামার যখন এরকম দাবি করেছে তখন তো পরীক্ষা করে দেখতেই হবে।

তিনি লোকজনদের ডেকে বললেন - এই লোহার মাছটার পেটে এক লক্ষ বস্তা শষ্য পুরে এটাকে জলে ভাসিয়ে দাও।

লোকজন রাজার নির্দেশ মতো কাজ করল। আরে কী কান্ড! লোহার মাছটা সত্যিই সেই বিপুল পরিমান শষ্য নিয়ে জলে বেশ সুন্দর ভেসে ভেসে চলল। সব লোকজন যারা দেখছিল তারা সবাই উত্তেজিত হয়ে বলাবলি করতে লাগল যে কামারের হাতের কাজ কী অসাধারন।

রাজাও মুগ্ধ হয়ে গেছেন। বললেন - তোমাকে আমি রাজসভায় একটা ভালো পদে নিযুক্ত করে সম্মানিত করব।

এইবার ছুতোর মিস্ত্রীর পালা। সে নিয়ে এলো একটা কাঠের ঘোড়া।

রাজা সেটা দেখেই বললেন - এটা তো ছোটদের খেলনা ঘোড়া। লোহার মাছের সঙ্গে এটার কোন তুলনাই হয় না।

ছুতোর বলল - না মহারাজ, এই কাঠের ঘোড়া ঐ লোহার মাছের থেকে অনেক গুনে ভালো।

-কী ভাবে সম্ভব তুমি বুঝিয়ে বলো।

-এই ঘোড়াটায় ছাব্বিশটা স্ক্রু আছে। প্রথম স্ক্রু আলগা করে দিলে ঘোড়াটা আকাশে উড়ে যাবে। দ্বিতীয় স্ক্রু আলগা করলে ঘোড়া আসতে আসতে সামনে এগোতে থাকবে। তৃতীয় স্ক্রু আলগা করলে ঘোড়ার গতি বাড়বে। এই ভাবে একটা একটা করে স্ক্রু আলগা করতে থাকলে ঘোড়ার গতি ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে। ছাব্বিশটা স্ক্রু-ই আলগা করে দিলে এই ঘোড়া পৃথিবীর যে কোন পাখির থেকে দ্রুত উড়তে পারবে। এই ঘোড়ায় চড়ে নিমেষে আপনি পৃথিবীর যে কোন জায়গায় পৌঁছে যেতে পারবেন।

সেই সময় সেখানে ছোট রাজপুত্র দিগ্বিজয় উপস্থিত ছিল। সে মন দিয়ে সব শুনছিল। তার খুব ইচ্ছে হল একবার ঘোড়াটায় চড়ে আকাশে উড়ে যেতে। সে মহারাজ কে বলল - বাবা, আমাকে একবার

এই ঘোড়াতে চড়ার অনুমতি দিন। আমার খুব জানার ইচ্ছে যে আকাশ থেকে পৃথিবীটাকে দেখতে কেমন লাগে।

রাজা সঙ্গে সঙ্গে প্রবল আপত্তি জানালেন। বললেন - এটা আদৌ উড়তে পারে কিনা তাই এখনো প্রমানিত হয় নি। তাছাড়া যদি ধরে নিই যে এটা উড়তে পারে, তাহলেও এটা যে আকাশে উড়তে উড়তে ভেঙ্গে পড়ে যাবে না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।

ছুতোর বলল - চিন্তা করবেন না মহারাজ। এই ঘোড়া খুব মজবুত আর উন্নতমানের। সেরকম কোন দুর্ঘটনা ঘটবে না।

কিন্তু মহারাজ তাও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। এপাশে ছোট রাজপুত্র বাবার কাছে বারবার ঘোড়ায় চড়ার আবদার করে চলেছে। মহারাজেরও মনটা খারাপ লাগছে। এর আগে কোনদিন এমন হয়নি যে রাজপুত্র কিছু চেয়েছে আর রাজামশাই তা দেননি। শেষে রাজামশাই বললেন-

ঠিক আছে। আমি তোমায় শুধু একবার চড়তে দিতে পারি। কিন্তু তোমায় কথা দিতে হবে যে তুমি কেবল প্রথম স্ক্রুটা আলগা করবে। অন্য কোন স্ক্রুতে তুমি হাত দেবে না।

রাজপুত্র দিগ্বিজয় রাজি হল। চেপে বসল ঘোড়ার পিঠে। আসতে আসতে করে আলগা করল প্রথম স্ক্রুটা। আর সত্যি সত্যিই ঘোড়াটা পালকের মতো হাওয়ায় ভেসে আকাশে উঠে গেল। রাজপুত্র নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল সে তার বাড়ি, শহর, আশে পাশের নদী, পাহাড় সব দেখতে পাচ্ছে। তার এতো ভালো লাগল যে সে দ্বিতীয় স্ক্রুটাও আলগা করে দিল। তখন তার ঘোড়া আসতে আসতে সামনে উড়ে চলল। সে দেখল নীচের চেনা শহর আসতে আসতে পিছনে সরে যাচ্ছে। পাখির মতো উড়ে যাচ্ছে সে। এতো ভালো লাগছিল চারিদিক দেখতে যে সে একের পর এক স্ক্রু আলগা করে চলল। ঘোড়ার গতিও ক্রমশঃ বাড়তে থাকল। আর কিছুক্ষনের মধ্যেই সে পরিচিত জায়গা ছেড়ে অনেক অনেক দূরে চলে এলো।

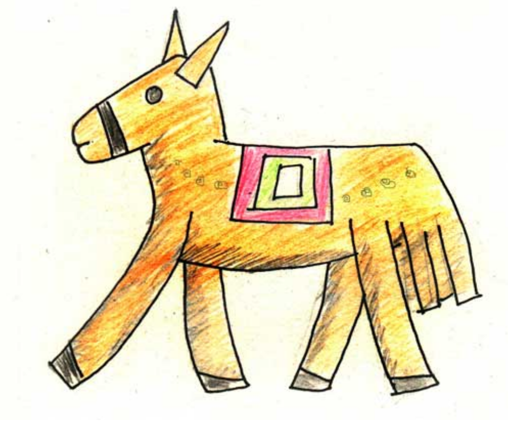

২

উড়তে উড়তে একসময় রাজপুত্রের খুব খিদে পেলো। সে দেখলো সে এক অচেনা শহরের ওপর দিয়ে

উড়ে যাচ্ছে। সে একে একে সব স্ক্রু এঁটে ঘোড়ার গতি কমিয়ে আসতে আসতে নেমে পড়ল সেই শহরে। কাছেই ছিল এক সরাইখানা। সেইখানে আশ্রয় নিল। খাওয়া দাওয়া সেরে রাত্রে শুয়ে শুয়ে সে ভাবছিল এমনি করে কাঠের ঘোড়ায় চড়ে উড়ে বেড়ানোর মতো মজাই আলাদা। চোখের পলকে যেখানে খুশি যাও। নতুন নতুন শহর দেখো। এত খুশি জীবনে সে কোনদিন হয়নি।

পরদিন সে হেঁটে হেঁটে শহরে ঘুরতে বেরলো। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখল সামনেই একটা বিশাল মাঠ। সেখানে অনেক লোক এসে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা দেখছে। রাজপুত্র ভাবলো আকাশে নিশ্চয় দারুন কিছু একটা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। সে ঐ ভীড়ের মধ্যে ঠেলে ঠুলে ঢুকে আকাশের দিকে তাকালো। কই কিছু তো নেই।

সে পাশের লোককে জিগ্যেস করল - কি দেখছ ভাই?

লোকটা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল। বলল - আমাদের দেশের রাজার একটি মাত্র কন্যা। রাজকন্যা অলকানন্দার মতো পরমা সুন্দরী এই দুনিয়ায় আর একটিও নেই। রাজা তাকে খুব ভালোবাসেন। রাজকন্যার যাতে কেউ কোনো ক্ষতি করতে না পারে তাই তিনি আকাশের মধ্যে একটা অট্টালিকা তৈরী করে সেখানে রাজকন্যাকে রেখে দিয়েছেন। প্রতিদিন রাজসভার কাজ শেষ হলে রাজা সেই অট্টালিকায় গিয়ে রাজকন্যাকে দেখে আসেন। আজও উনি গেছেন। আর কিছুক্ষনের মধ্যেই ফিরে আসবেন। তাই সবাই ওনার ফেরার অপেক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজপুত্রের এই গল্প খুব অবিশ্বাস্য লাগল। বলল

-আকাশে আবার অট্টালিকা বানানো যায় নাকি? কোন মানুষ এমন অট্টালিকা বানিয়েছে বলে তো কোনদিন শুনিনি।

-মানুষ নয়, এক দেবতা রাজাকে বানিয়ে দিয়েছেন ঐ অট্টালিকা। সেই দেবতার দেওয়া রথে চড়েই রাজা সেই অট্টালিকায় যাতায়াত করেন।

এ খবর শুনে রাজপুত্র খুব উৎসাহিত হয়ে পড়ল। সে তখনই সরাইখানায় ফিরে গিয়ে তার কাঠের ঘোড়ায় চড়ে বসল। তারপর একটা একটা করে স্ক্রু আলগা করে আকাশে উড়ে গেল। আকাশে উড়ে উড়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল সেই অট্টালিকা। কিছুক্ষনের মধ্যেই সে দেখতে পেল মেঘের মধ্যে এক অসাধারন সুন্দর অট্টালিকা 'মেঘ-মঞ্জিল'। রাজপুত্র সোজা গেট দিয়ে উড়ে ঢুকে গেল ভেতরে। তারপর সব স্ক্রু এঁটে ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ল।

রাজা তখন অট্টালিকা থেকে সবে বিদায় নিয়েছেন। রাজকন্যা অলকানন্দা বিশ্রাম নিচ্ছিল। হঠাৎ রাজপুত্র দিগ্বিজয়কে দেখে সে খুব অবাক হয়ে গেল। এত সুপুরুষ কোন মানুষকে সে আগে দেখে নি। ভাবল বুঝি কোন দেবতা এসেছেন। রাজপুত্র ভাবলো এমন সুন্দরী রাজকন্যা সত্যিই দুনিয়ার আর কোথাও মিলবে না। প্রথম দেখাতেই তারা দুজনে দুজনকে ভালোবেসে ফেলল। রাজকন্যা কাছে এসে রাজপুত্রকে অভ্যর্থনা জানালো। রাজপুত্র তার পরিচয় দিতে সে তার হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল। বসতে দিল, খেতে দিল। তারপর সারা রাত অনেক গল্প করল দুজনে।

পরদিন সকালে রাজপুত্র কাঠের ঘোড়ায় চরে তার সরাইখানায় ফিরে গেল। এপাশে সভা শেষ হলে

বিকেলের দিকে রাজা এলেন রাজকন্যাকে দেখতে। অন্য সব দিন রাজকন্যা খুব গম্ভীর হয়ে থাকে। কিন্তু আজ তাকে খুব হাসি খুশি দেখাল। গুন গুন করে গান গাইছে। রাজার কেমন সন্দেহ হল। রোজ রাজা এসে রাজকন্যার ওজন মাপেন। রোজই একই থাকে। কিন্তু আজ ওজন এক কেজি বেশি হল। দেবতার তৈরী এই অট্টালিকায় কারো ওজন বাড়ে না। একমাত্র রাজকন্যা অন্য কোন মানুষকে ছুঁয়ে থাকলে তবেই তার ওজন বাড়বে। রাজা নিশ্চিত হলেন যে কেউ এখানে এসেছিল। রাজার অনুমতি ছাড়া এখানে কেউ কি ভাবে আসতে পারে ভেবে পেলেন না। রাজকন্যার সঙ্গে বেশি কথা না বলে তাড়াতড়ি নিজের প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

এত তাড়াতাড়ি রাজাকে ফিরে আসতে দেখে সভাসদরা খুব অবাক হল। এপাশে রাজার মুখও খুব গম্ভীর। নিশ্চয় কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে। রাজাকে জিগ্যেস করতে রাজা সব কথা খুলে বললেন।

-আমি ছাড়া কোনো একজন রাজকন্যার প্রাসাদে গিয়েছিল। তাকে ধরার ব্যবস্থা করতে হবে।

একজন সভাসদ বললেন

-আপনি দেশের সেরা যোদ্ধাদের মধ্যে চারজনকে বেছে নিয়ে রাজকন্যার অট্টালিকার চারকোনে দাঁড় করিয়ে রাখুন। তারাই রাজকন্যাকে পাহারা দেবে। কেউ এলে তাকে তৎক্ষনাৎ গ্রেপ্তার করবে।

রাজার মনে ধরল কথাটা। সে চারজন যোদ্ধাকে নিয়ে গেল অট্টালিকায়। তাদেরকে কি কি করতে সব বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে এলো।

কিন্তু কোন লাভ হল না। যোদ্ধারা আর কতক্ষন একটানা জেগে থাকবে? এক সময় তার চারজনেই ঘুমিয়ে পড়ল। তখন রাজপুত্র রাজকন্যার অট্টালিকায় গেলো। রোজকার মতো তার সঙ্গে দেখা করে, গল্প করে ভোরের বেলা ফিরে এলো সরাইখানায়।

রাজা পরদিন এসে রাজকন্যাকে আগের দিনের থেকেও বেশি হাসি খুশি দেখলেন। ওজন মেপে দেখলেন আগের দিনের থেকে আরো এক কেজি বেশি। বুঝতে পারলেন সেই আগন্তুক আগের রাত্রেও এসেছিল। রাজা রেগে আগুন হয়ে গেলেন। নিজের প্রাসাদে ফিরে গিয়ে তার সভাসদদের সঙ্গে জরুরী আলোচনায় বসলেন।

এক সভাসদ বললেন - রাজকন্যার বিছানায় আর চেয়ারে নতুন এক পোচ রঙ লাগিয়ে দেওয়া হোক। যে এসে বসবে ওখানে, তারই জামাকাপড়ে রং লেগে যাবে। তারপর আমরা সারা রাজ্য তল্লাশি করে দেখব কার পোশাকে ঐ রং লেগে আছে।

রাজার মনে ধরল কথাটা। সেই মত কাজও হল।

সেদিন রাত্রে রাজপুত্র গিয়ে রাজকন্যার সঙ্গে গল্প করে যখন ফিরিছিল তখন দেখল তার গায়ে বিশ্রী রং লেগে রয়েছে। সে রং লাগা জামাকাপড় খুলে ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল নিচে। এ পাশে হয়েছে কি সেই সময় এক বুড়ো লোক নীচে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সে রোজ ভোরবেলা বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোকদের ঘুম থেকে ডেকে দিয়ে প্রার্থনায় বসতে বলে। হঠাৎ আকাশ থেকে জামাকাপড় পড়তে দেখে সে খুব অবাক হয়। খুব ভাল জামাকাপড়, শুধু একটু রং লাগা। ভগবানের-র আশীর্বাদ ভেবে সে খুশি মনে সেই জামাকাপড় নিয়ে গিয়ে বাড়িতে রেখে দিল।

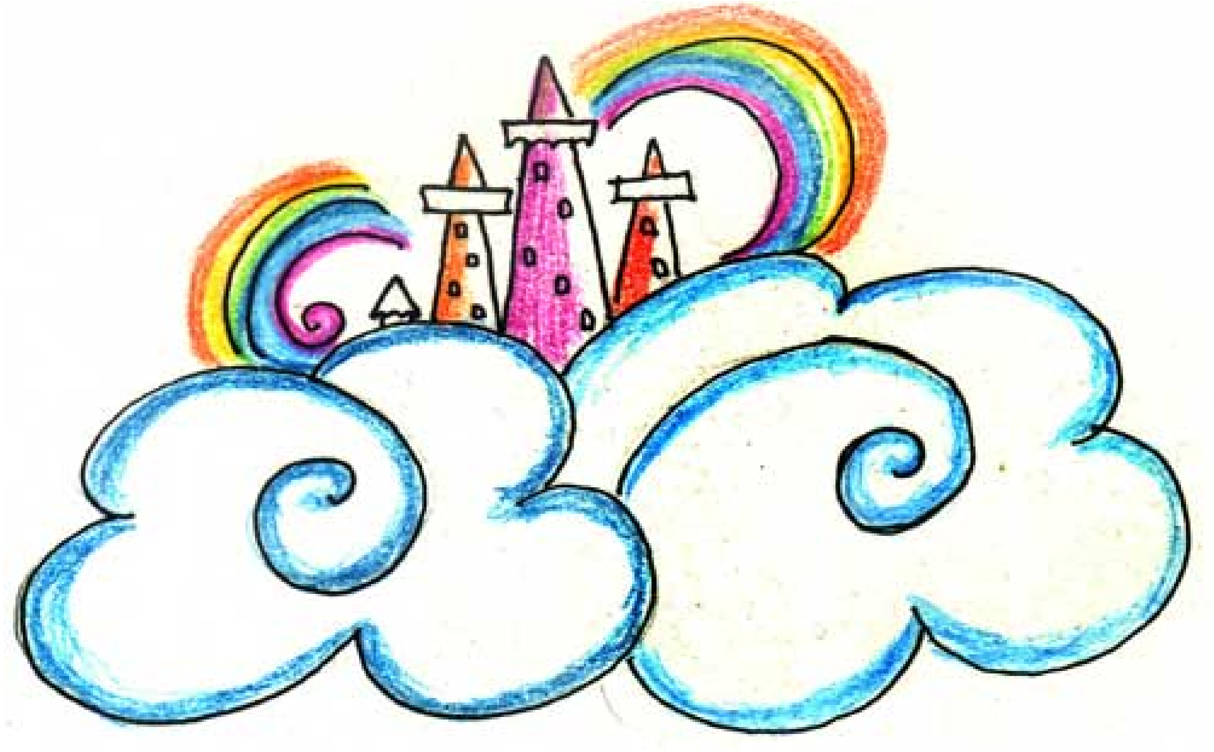

### ৩

সে দিন রাত্রে, রাজার গুপ্তচর বাহিনী চুপি চুপি সব লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশি চালালো। সেই বুড়ো লোকটির বাড়িতে গিয়ে রঙ লাগা জামাটি খুঁজে পেল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটিকে গ্রেপ্তার করে রাজার কাছে এনে হাজির করল তারা।

লোকটিকে রাজা জিগ্যেস করলেন - জামায় রং লাগল কি করে?

লোকটি বলল - রাস্তায় এটা পড়ে থাকতে দেখে আমি তুলে এনেছিলাম। তখন থেকেই এতে রং লেগে ছিল।

রাজা সেসব কথা বিশ্বাস করলেন না। তাকে ফাঁসির আদেশ দিলেন।

সারা শহরে এই খবর রটে গেল। সবাই মিলে ভীড় করল ফাঁসি দেওয়ার জায়গায়। সবার কৌতুহল কি করে ঐ লোকটি আকাশের মধ্যে তৈরী অট্টালিকাতে যাতায়াত করতো। কিন্তু তারা যখন দেখলো এক বুড়ো মানুষকে ফাঁসি দেওয়ার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন খুব অবাক হল। ঐ বুড়ো লোকটা আসল দোষী বলে বিশ্বাস করতে পারল না। সবাই ভাবল কোথাও একটা বড় ভুল হচ্ছে।

এ পাশে রাজপুত্র দিগ্বিজয়ের কানেও একথা পৌঁছলো। সে তার কাঠের ঘোড়া কাঁধে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়ার জায়গায় এসে উপস্থিত হল। চেঁচিয়ে বলল

-ওকে ফাঁসি দিও না। ও আসল দোষী নয়। আমিই রোজ আকাশে তৈরী ঐ অট্টালিকায় যাই

রাজকন্যার সঙ্গে দেখা করতে। ফাঁসি দিতে চাইলে আমাকে ফাঁসি দাও। বুড়ো মানুষটাকে ছেড়ে দাও।

রাজা দূরে বসে সব দেখছিলেন। তিনি আদেশ করলেন

-বুড়ো লোকটিকে ছেড়ে দাও। আর যে ছেলেটি তার নিজের দোষ স্বীকার করেছে তাকে ফাঁসি দাও।

সুতরাং তারা বুড়ো লোকটিকে ছেড়ে দিল। সে মনের আনন্দে বাড়ি চলে গেল। তখন সব লোকজন ও জল্লাদ রাজপুত্রকে ফাঁসি দেবে বলে ধরে নিয়ে যেতে এলো। কিন্তু রাজপুত্র কাঠের ঘোড়ায় চড়ে স্ক্রু আলগা করে সঙ্গে সঙ্গে সবার চোখের সামনে দিয়ে ওখান থেকে উড়ে পালিয়ে গেল। রাজা যখন দেখল তার এত লোকজন এত সেপাই একটা ছেলেকে ধরতে পারল না তখন তিনি রাগে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

রাজপুত্র কাঠের ঘোড়ায় চড়ে সোজা এলো মেঘ-মঞ্জিলে, রাজকন্যার কাছে। বলল

-তোমার বাবা জানতে পেরে গেছেন যে আমি রোজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসি। তিনি আমাকে ধরতে পারলে ফাঁসি দিয়ে দেবেন। কিন্তু আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। তুমি আমার সঙ্গে আমাদের রাজ্যে চলো। আমার বাবা তোমাকে নিশ্চয় পছন্দ করবেন। আমাদের বিয়েও দিয়ে দেবেন।

রাজকন্যা বলল – তুমি যেখানে যাবে আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

তারা দুজনে কাঠের ঘোড়ায় চেপে উড়ে পালিয়ে গেল সেই অট্টালিকা থেকে।

অনেক অনেকক্ষন উড়ে চলল তারা। হঠাৎ রাজকন্যা অলকানন্দা কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় সে চেঁচিয়ে বলল

-আমি দুটো জিনিষ আনতে ভুলে গেছি। ওগুলো আমার কাছে আমার মায়ের একমাত্র স্মৃতি। ইচ্ছে ছিল আমাদের বিয়ের সময় ঐ পাথর দুটো আমি তোমার বাবা মাকে উপহার দেবো। আমি একবার মেঘ-মঞ্জিলে ফিরে গিয়ে ও গুলো নিয়ে আসতে চাই।

রাজপুত্র দিগ্বিজয় বলল – আমরা মেঘ-মঞ্জিল থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। এখন আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু রাজকন্যা বার বার অনুরোধ করতে থাকল। তখন রাজপুত্র কাঠের ঘোড়ার স্ক্রুগুলো এঁটে নীচে নেমে পড়ল। বলল – আমি এখানেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। তুমি এই কাঠের ঘোড়ায় চড়ে মেঘ-মঞ্জিলে যাও আর কাজ সেরে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

রাজকন্যাকে ঘোড়ায় ওড়ার সব নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দিল। রাজকন্যা আবার একটা একটা করে স্ক্রু আলগা করে আকাশে উড়ে চলে গেল।

এপাশে রাজা রাজকন্যাকে নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন। মেঘ-মঞ্জিলে কোন আগন্তুক আসছে রোজ রোজ। সে যদি রাজকন্যার কোন ক্ষতি করে তখন কি হবে এই সব ভেবে আজ সকাল সকাল পাড়ি দিয়েছিলেন। এসে দেখলেন ফাঁকা অট্টালিকা। রাজকন্যা নেই। রাজা তো একদম ভেঙ্গে পড়লেন। কি করবেন, কোথায় রাজকন্যাকে খুঁজতে যাবেন। এমন সময় হঠাৎ রাজকন্যা কাঠের ঘোড়ায় চড়ে ফিরে আসে প্রাসাদে। রাজকন্যাকে দেখেই রাজা তার সৈন্যদের নির্দেশ দেয় রাজকন্যাকে বন্দী করার জন্যে।

কাঠের ঘোড়াটাকে কি করে ব্যাবহার করা যায় বুঝতে না পেরে রাজা ওটাকে ফেলে রেখে দিলেন একটা ফাঁকা ঘরে।

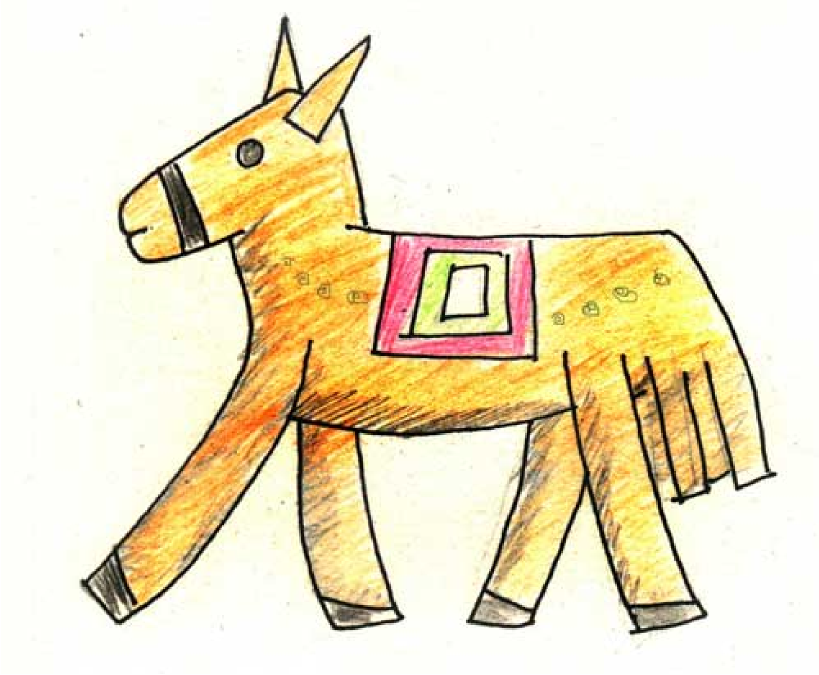

৪

অনেক দিন আগে এক ভিনদেশের রাজা রাজকন্যা অলকানন্দার অসামান্য সৌন্দর্যের কথা শুনে রাজার কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন যে তিনি তার পুত্র রাজকুমার সোমদেবের সাথে রাজকন্যার বিয়ে দিতে চান। কিন্তু রাজা তখন সে আবেদন প্রত্যাখান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন রাজা ভাবলেন রাজকন্যাকে এই ভাবে রক্ষা করা অসম্ভব। তার থেকে ভীনদেশের সেই রাজকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়াই ভাল।

তিনি ভিনদেশের রাজার কাছে দূত পাঠালেন। সঙ্গে লিখে দিলেন এক চিঠি – আমার কন্যার এখন বিয়ের বয়স হয়েছে। আমি চাই আপনার পুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হোক। বিয়েটা সুসম্পন্ন হলে আমরা চির আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ হব ও আমাদের দুই দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হবে। আপনি যদি এই প্রস্তাবে রাজি থাকেন তাহলে দয়া করে রাজপুত্রকে নিয়ে আমাদের দেশে আসুন ও বিবাহ সুসম্পন্ন হলে পুত্রবধূ নিয়ে নিজের দেশে ফিরে যান।

৫

এ পাশে রাজপুত্র দিগ্বিজয় রাজকন্যা অলকানন্দার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। কিন্তু অনেকক্ষন অপেক্ষা করার পরেও রাজকন্যার দেখা না পেয়ে তার মন খুব খারাপ হয়ে যায়। এখন সে কি করে! রাজকন্যাও নেই। তার অত শখের কাঠের ঘোড়াটাও নেই। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে সে এক মরুভূমির

মধ্যে বসে আছে। যে দিকে যতদূর চোখ যায় ধূ ধূ করছে শুধু বালি আর বালিয়াড়ি। মাথার ওপর প্রখর সূর্য। কাঠ ফাটা রোদ আর ভয়ানক গরম। কোথাও সবুজের কোন চিহ্ন মাত্র নেই।

যত সময় যেতে থাকে তত খিদে আর তেষ্টায় সে কাতর হয়ে পড়ে। শেষে এক সময় সে আর থাকতে না পেরে জলের খোঁজে হাঁটতে শুরু করে। কিন্তু কোথাও কোন জলও নজরে পড়ে না। ভাবল বালির পাহাড়গুলোর ওপর উঠলে কিছুটা দূর পর্যন্ত দেখা যাবে। বুঝতে পারা যাবে জল কোন দিকে আছে। কিন্তু বালির পাহাড়ের ওপর উঠতে গিয়ে তার পা এমন বালির মধ্যে ঢুকে যেতে লাগল যে হাঁটাই কষ্টকর। অনেক পরিশ্রম করে সে যখন ওপরে পৌঁছল তখন মনে হল পায়ের তলার বালিটা কেমন ঠান্ডা ঠান্ডা। দেখল বালির পাহাড়ের অন্য দিকে এক সুন্দর সবুজ বাগান। সে গড়িয়ে গড়িয়ে পাহাড় থেকে নেমে পড়ল। বাগান ভরা ফলের গাছ দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। লাল, সবুজ আরও নানা রঙ-বেরঙের পাকা পাকা ফল দেখে সে লোভ সম্বরন করতে পারল না। খিদেও পেয়েছিল খুব। সে তাড়াতাড়ি কয়েকটা পাকা পীচ ফল পেড়ে এক গাছের ছায়ায় বসে খেয়ে নিল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল গাছের তলাতেই।

যখন তার ঘুম ভাঙ্গল, তখন তার গাল আর চিবুকে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। হাত দিয়ে দেখল গোঁফ দাড়িতে ভর্তি হয়ে গেছে মুখ। খুব অবাক হয়ে গেল সে। কি হতে পারে তার এই ভাবতে ভাবতে সে ফলের বাগানে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। ভাবল বুঝি পীচ খেয়েই তার এরকম দাড়ি গোঁফ গজিয়েছে। একটু পরে আবার খিদে পেয়ে গেল তার। কিন্তু এবার ভয়ে সে আর পীচ খেল না। দেখল অনেক গুলো ন্যাসপাতি গাছও আছে। একটা গাছের ডাল সাবধানে নীচু করে কয়েকটা বড় দেখে ন্যাসপাতি পেড়ে খেয়ে নিল। তারপর আবার ঘুম পেয়ে যায়। তাই গাছের তলাতেই ঘুমিয়ে পড়ে।

যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ঘুম থেকে উঠে বসতে গিয়ে মাথাটা খুব ভারি লাগল। মাথায় হাত দিতেই বুঝতে পারল তার দুটো মোটা মোটা শিং গজিয়েছে। তার দাড়িটাও বেড়ে এক হাত লম্বা হয়ে গেছে। কি ভয়ংকর দেখতে লাগছে তাকে এই ভেবে আঁতকে উঠলো সে। রাজকন্যা যদি এখন কাঠের ঘোড়ায় চড়ে ফেরতও আসে তাহলেও ওকে চিনতে পারবে না, ভালো ও বাসবে না আর।

তাহলে এখন কি করা যায় ভেবে দুঃখে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করল। কাঁদতে কাঁদতে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল।

খুব বুড়ো একটা লোক তার কাছে এসে জিগ্যেস করছে - বাছা, তুমি এতো বিমর্ষ কেন?

ও তখন সব খুলে বলল লোকটিকে। লোকটি বলল

-চিন্তা কোরো না। যাও গিয়ে কয়েকটা শুকনো পীচ আর ন্যাসপাতি গাছের তলা থেকে কুড়িয়ে নাও। সে গুলো খেয়ে ফেললেই তোমার গোঁফ দাড়ি আর শিং সব অদৃশ্য হয়ে যাবে। তুমি আবার আগের মতো সুন্দর হয়ে যাবে। তারপর এই জায়গা ছেড়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাও। এখানে অনেক দুষ্ট দানব, দৈত্য, ভূত প্রেতরা থাকে। তারা এখন ঘুমিয়ে আছে। জেগে উঠলেই তোমাকে মেরে খেয়ে ফেলবে।

ঘুম ভেঙ্গে যায় রাজপুত্র দিগ্বিজয়ের। চোখ মুছে উঠে বসে সে। ঠান্ড হাওয়া দিচ্ছে। ও তাড়াতাড়ি উঠে স্বপ্নে দেখা বুড়োটার কথা অনুযায়ী শুকনো পীচ আর ন্যাসপাতি কুড়িয়ে নেয় গাছের তলা থেকে।

সেগুলো মুখে পুরে চিবোতে আরম্ভ করে। দেখতে না দেখতে সত্যিই তার দাড়ি গোঁফ আর শিং সব মিলিয়ে গিয়ে ও আবার আগের মতো হয়ে যায়। সে খুশিতে ডগমগ হয়ে যায়।

তারপর কি যেন ভাবে। তারপর উইলো গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে তাই দিয়ে এক ঝুড়ি বানায়। সেউ ঝুড়ি ভরে অর্ধেক পাকা আর অর্ধেক শুকনো পীচ আর ন্যাসপাতি ভরে নেয়। তারপরেই ঐ বাগান ছেড়ে জলদি পালিয়ে যায়।

যে করেই হোক তাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। কিন্তু কোন পথে গেলে বাড়ি পৌঁছবে তা বুঝতে পারে না। তাই শুধু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। খাদ্য হিসেবে শুকনো পীচ আর ন্যাসপাতিই এখন তার একমাত্র ভরসা। ঘুম পেলে ঘুমাতে হবে এই মরুভূমিতেই। সে তাও চলতেই থাকে। এই ভাবে সাত দিন সাত রাত্রি হেঁটে চলে সে। মানুষ তো দূরের কথা কোথাও কোন পাখিও নজরে পড়ে না তার। হতাশ হয়ে মাঝে মাঝে মরুভূমিতেই বসে পড়ে। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার নতুন উদ্যমে সে হাঁটতে থাকে।

শেষ একটা বিশাল চওড়া রাস্তা দেখতে পায়। সে ভাবে রাস্তা যখন আছে, তখন কোন না কোন লোক এখান দিয়ে ঠিক যাবে। এই আশায় সে রাস্তার ধারে বসে বিশ্রাম করে। হঠাৎ দেখে একটা লোক গাধার পিঠে চেপে যাচ্ছে। লোকটার সঙ্গে কথা বলে ও জানতে পারে যে ওর নিজের দেশ পূর্ব দিকে আর রাজকন্যা অলকানন্দার দেশ পশ্চিমে। কিন্তু দুটো দেশই অনেক অনেক দূরে। হেঁটে পৌঁছতে অনেক দিন লাগবে। কাঠের ঘোড়াটা থাকলে এক নিমেষে পৌঁছে যেতে পারত। কিন্তু সেটাও নেই সঙ্গে। ভাবতে থাকে কোন দিকে যাবে। রাজকন্যার কথা মনে পড়তে ঠিক করল রাজকন্যার দেশেই আগে যাবে। রাস্তা দিয়ে পশ্চিম দিকে হাঁটতে শুরু করল সে।

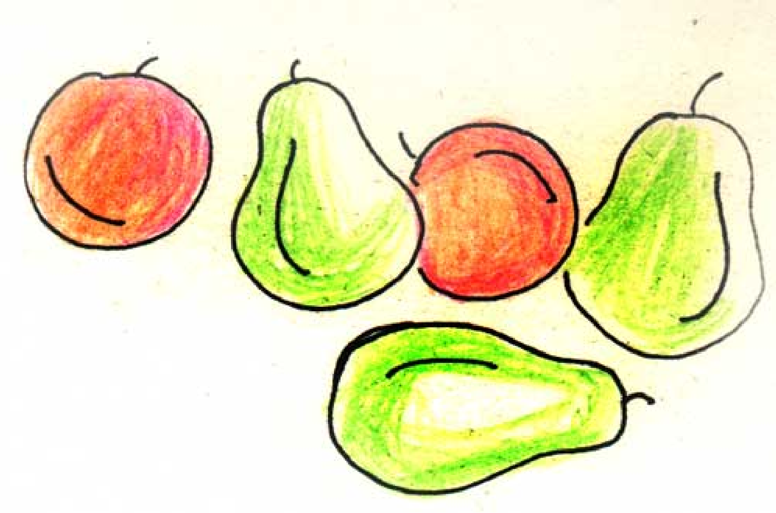

### ৬

অনেকক্ষন হাঁটার পর হঠাৎ অনেক লোকজনের গলার আওয়াজ পেল। যেন কেউ জোরে জোরে কিছু আদেশ করছে। তারপর একটু অপেক্ষা করতেই দেখতে পেল একটা বিশাল রাজকীয় শোভাযাত্রা চলেছে।

ঘোড়ায় চেপে চলেছে অনেক সৈন্য সামন্ত, ঘোড়ায় টানা গাড়িও আছে অনেক। শোভাযাত্রার মাঝে বড় ও খুব সুন্দর একটা সোনার কাজ করা গাড়ি। তার তিনদিকে কাঁচের জানলা, একদিকে কাঁচের দরজা। যে চারটে ঘোড়া টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেই গাড়িটা তাদের গায়ে মাথায়ও সোনার কাজ। চারিদিকে সৈন্যরা নিশ্ছিদ্র পাহারা দিয়ে চলেছে।

রাজপুত্র ওদের পথ করে দেওয়ার জন্যে রাস্তা থেকে একটু সরে দাঁড়ায়। হঠাৎ গাড়িটা এসে ওর সামনে থেমে গেল। একটা প্রহরী জিগ্যেস করল

– তুমি কি বিক্রী করছ?

– কিছু না।

লোকটি ওর ঝুড়ির দিকে দেখিয়ে জিগ্যেস করল – তোমার ঝুড়িতে তো পীচ আর ন্যাসপাতি আছে। আমাদের রাজপুত্র খুব ক্ষুধার্থ। আমরা ঐ ফলগুলো কিনতে চাই। কত দামে বিক্রী করবে?

-কিন্তু এই ফলগুলো বিক্রীর জন্যে নয়। এগুলো আমি রাস্তায় খিদে পেলে খাবো বলে নিয়ে যাচ্ছি। দেখছ না এখানে কোথাও কিছু পাওয়া যায় না। একটুও সবুজের কোন চিহ্নমাত্র নেই। এগুলো বিক্রি করে দিলে আমি কি খেয়ে বেঁচে থাকব?

ভিনদেশী রাজকুমার গাড়ির ভেতর থেকে একটা মোহর এগিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বলল

-যা দাম চাইছে তাই দিয়ে ফলগুলো কিনে নাও। রাস্তায় বেশি সময় নষ্ট করো না।

সে জিগ্যেস করল – তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

-আমাদের রাজকুমার পশ্চিমে বিয়ে করতে যাচ্ছেন।

প্রহরীকে আরো কিছু প্রশ্ন করে সে বুঝতে পারল এরা রাজকন্যা অলকানন্দার দেশেই যাচ্ছে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু বাইরে কিছু প্রকাশ করল না। সে ফল বিক্রি করতে রাজি হল। মোহরটা নিয়ে সে বেছে বেছে সব থেকে ভালো দেখে দুটো পীচ আর দুটো ন্যাসপাতি দিল।

ভিনদেশের রাজকুমার সোমদেব এমন সুন্দর ফল দেখে খুব খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি গোগ্রাসে খেয়ে ফেলল। শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল। গাড়ির দুলুনিতে তার ঘুমিয়ে পড়তে বেশি সময় লাগল না। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন সে নিজের অবস্থা দেখে হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করল। প্রহরীরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে। গাড়ির ভেতরে মুখ বাড়িয়ে দেখে রাজকুমার নয় যেন এক দৈত্য বসে আছে। মুখে বিশাল সাদা দাড়ি, মাথায় বিশাল দুটো শিং। তারা আতঙ্কিত হয়ে চেঁচামিচি আরম্ভ করল। গোটা শোভাযাত্রাটাই তখন থেমে গেল। সবাই ভাবল ফলওয়ালার ফল খেয়েই এই অবস্থা হয়েছে। ওরা শোভাযাত্রা থামিয়ে ফলওয়ালার জন্যে অপেক্ষা করে থাকল। কিছুক্ষন পরে ফলওয়ালা বেশি রাজপুত্র দিগ্বিজয় আসতেই ওরা তাকে চেপে ধরে

-কি রকম ফল তুমি আমাদের রাজকুমারকে বিক্রি করছ শুনি?

-কেন? গাছ থেকে টাটকা ফল পেড়ে নিয়ে এসেছি আমি।

-তাহলে ফল খাওয়ার পরই আমাদের রাজকুমারের এমন এক হাত দাড়ি আর দুটো শিং গজালো কেন?

সে গাড়ির জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল ভিনদেশী রাজকুমারের কিম্ভুত কিমাকার রূপ। মনে মনে খুব খুশি হল। মুখে বলল - তা আমি কি জানি! আমি তো এই ফল রোজই খাই। কই আমার তো কিছু হয় নি।

এর উত্তরে তারা কিছুই বলার মতো খুঁজে পেল না। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ করল। এই রকম চেহারা নিয়ে তো কোন রাজকন্যাকে বিয়ে করতে যাওয়া যায় না। গেলেও রাজকন্যার বাড়ির লোকেরা তাড়িয়ে দেবে ওদের। তার থেকে দেশে ফিরে যাওয়াই ভালো। কিন্তু রাজকুমার কিছুতেই দেশে ফিরে যেতে রাজি হল না।

শেষে ভিনদেশের রাজার সব থেকে প্রিয় অমাত্য এসে বল

-আমরা আপাততঃ একটা কাজ করতে পারি। একটা সুন্দর দেখতে ছেলেকে খুঁজে নিয়ে তাকেই রাজকুমার বলে কাজ চালিয়ে দিই। বিয়ের পর রাজকন্যা নিয়ে আমরা দেশে চলে যাব। তখন তো সবটা আমাদেরই হাতে থাকবে। রাজকন্যাকে নিয়ে কি করা হবে তা তখন ভিনদেশের রাজাই স্থির করবেন।

সবার এই পরিকল্পনাটি পছন্দ হল। তারা একটা সুন্দর দেখতে ছেলের খোঁজ করতে লাগল। শেষে ফলওয়ালাকে দেখে সবাই একমত হল যে ওখানে যতজন আছে তার মধ্যে সেই সব থেকে সুপুরুষ। সবাই তাকে অনুরোধ করল রাজপুত্র সেজে তাদের কথা মত কাজটা সুসম্পন্ন করে দিতে।

রাজপুত্র দিগ্বিজয় তো মনে মনে খুব খুশি হল। কিন্তু এমন ভাব করল যে সে এরকম কাজ করতে একেবারেই রাজি নয়। বলল সে তার কাজে বেরিয়েছি। তার এখন এসবের জন্যে একেবারেই সময় নেই। তারা অন্য লোক খুঁজে নিক।

রাজপারিষদরা, অমাত্যরা, প্রহরীরা সবাই মিলে ওকে অনেক অনুরোধ উপরোধ করতে লাগল। বলল

– তোমায় পাঁচটা মোহর দেবো।

রাজপুত্র বলল – মাত্র পাঁচটা মোহরের জন্যে এরকম ছল-চাতুরীর কাজ আমি করতে পারব না

-তাহলে সাতটা দেবো।

তখন রাজপুত্র রাজি হল। তাকে ওরা ভিনদেশী রাজকুমারের মতো রাজার পোশাক সাজিয়ে দিল। বলল

– রাজকুমারের মতো সোজা হয়ে গাড়ির মধ্যে বসে থাকতে। আর রাজকুমার সোমদেবকে গাড়ি থেকে বার করে ঘোড়ায় চাপিয়ে দেওয়া হল। তার মাথার শিং আর দাড়ি সব ঢেকে দিল কাপড় দিয়ে। তাকে সব সময় মুখ ঢেকে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হল। আরো বলা হল যে রাজধানীতে পৌঁছলে সে যেন সব সময় ঘরের ভেতরেই থাকে। বাইরে বেরনোর কোন দরকার নেই। বাকি যা ব্যবস্থা করার তা তারাই করবে।

## ৭

সব কিছু ঠিকঠাক হওয়ার পর শোভাযাত্রা আবার চলতে শুরু করল। যখন তারা রাজধানীতে পৌঁছালো তখন দেখল শহরের মূল ফটকের বাইরে রাজা নিজে তাদের স্বাগতম জানানোর জন্যে অপেক্ষা করছেন। এমন সুন্দর জামাই দেখে আর এতো রকম বিয়ের উপঢৌকন দেখে রাজা তো আনন্দে আত্মহারা। গত কয়েকদিন ধরে রাজকন্যাকে নিয়ে রাজার দুঃশ্চিন্তায় ঘুম হচ্ছে না। রাজকন্যার পূর্ব কাহিনী জেনে ফেললে যদি রাজপুত্র বিয়ে করতে বেঁকে বসে তাহলে খুব মুশকিল হবে। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভালোয় ভালোয় বিয়েটা হলে উনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন।

রাজার নির্দেশে তড়িঘড়ি চারদিন জুড়ে বিয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। রাজা সব কমবয়সীদের বললেন বাড়ির ভেতরেই থাকতে। আর বড়দের বলা হল বাড়ির বাইরে এসে অতিথি অভ্যাগতদের আদর-আপ্যায়ন করতে। প্রধান উদ্দেশ্য হল অতিথিদের আমোদ আহ্লাদে ব্যস্ত রাখা যাতে তারা রাজকন্যা সম্বন্ধে বেশি কিছু কৌতুহল দেখানোর অবকাশ না পায়।

প্রথম তিন দিন তো রাজকন্যা শুধু কেঁদেই গেল। মুখ থেকে কাপড় সরালো না। রাজপুত্রর দিকে তাকিয়েও দেখল না। চতুর্থ দিনে রাজা একটা বয়স্কা মহিলাকে পাঠালেন ওদের ওপর নজর রাখার জন্যে। তার ওপরে নির্দেশ ছিল রাজাকে খবর দিতে হবে রাজপুত্র রাজকন্যার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে কিনা।

সেই সন্ধ্যে বেলা রাজপ্রাসাদের বিশাল হলে রাজপুত্র রাজকন্যার পাশে বসেছিল। যখন কেউ তাকাচ্ছিল না তাদের দিকে তখন রাজপুত্র রাজকন্যার কানে ফিস ফিস করে বলল

-দেখো। আমিই ফিরে এসেছি। তোমাকে বিয়ে করার জন্যে।

রাজকন্যা পরিচিত গলা শুনে অবাক হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল। দেখেই খুব অবাক হয়ে গেল।

-তুমি কোথা থেকে এলে?

তখন রাজপুত্র গোটা গল্পটা সংক্ষেপে ওকে বলল। বলল এমন ভাব করে থাকতে যেন ও কিছুই জানে না। যখন ওরা একসঙ্গে নাচছিল তখন ওরা কি ভাবে এখান থেকে পালাবে তার পরিকল্পনা করল। রাজপুত্র বলল

-বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর যখন তোমার চলে যাওয়ার সময় হবে তখন তুমি বাবাকে কাঠের ঘোড়াটা চাইবে। বাবা না দিতে চাইলেও বায়না করে যাবে। বলবে ঐ কাঠের ঘোড়া না দিলে তুমি কিছুতেই এখান থেকে যাবে না। তোমার বাবা তোমাকে যতই ভয় দেখাক তাও তুমি তোমার দাবীতে অনড় থাকবে।

এপাশে ওদের কে এক সঙ্গে এমন খুশি মনে নাচতে দেখে রাজার গুপ্তচর গিয়ে রাজাকে খবর দিল যে,

রাজকন্যা আর রাজপুত্র একেবারে মানিকজোড়। দুজনে দুজনকে খুব পছন্দ করেছে। একসঙ্গে নাচছে, গান গাইছে। খুব সুখী হবে ওরা দুজনে। এই শুনে রাজা খুব আনন্দিত হলেন।

## ৮

বিয়ে ভালোয় ভালোয় মিটে গেছে। পরদিন রাজকন্যা ভিনদেশে শ্বশুরবাড়ি যাবে। রাজকন্যাকে বিদায় জানানোর জন্যে সব লোকজন জড়ো হয়েছে। প্রাসাদের বাইরে ভিনদেশের লোকজন শোভাযাত্রা সাজিয়ে প্রস্তুত। এমনসময় রাজকন্যা অলকানন্দা বায়না জুড়ল। কাঠের ঘোড়াটা তার চাই-ই চাই। না হলে সে এক পাও নড়বে না। রাজা রাজকন্যার এই অদ্ভূত বায়না কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে রাজি নন। তিনি তীব্রভাবে তার আপত্তি জানালেন। রাজকন্যা তাও শুনল না, বায়না করেই চলেছে। রাজা শেষে ভয়ানক রেগে গিয়ে রাজকন্যাকে ফাঁসিতে চড়ানোর আদেশ দিলেন। কিন্তু রাজকন্যার তাতেও কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। জানিয়ে দিল কাঠের ঘোড়া না পেলে সে ফাঁসিতেই মৃত্যু বরন করবে।

রাজা পড়লেন মহা ফাঁপরে। কি করা উচিত কিছুতেই ভেবে পাচ্ছেন না। এপাশে রাজকন্যার বিদায় শোভাযাত্রা দেখবে বলে বাইরে অসংখ্য লোক প্রতীক্ষা করে রয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু গন্যমান্য ব্যক্তি রাজপ্রাসাদের ভেতরে এসে জিগ্যেস করলেন – কিসের জন্যে যাত্রায় এত বিলম্ব হচ্ছে?

রাজা বললেন – রাজকন্যা অলকানন্দা তার পুরানো এক কাঠের ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় বলে আবদার জুড়েছে।

তারা এই শুনে খুব হেসে উঠে বললেন – একটা খেলনার জন্যে এত বায়না করছে তো সেটা দিয়ে দিলেই হয়।

রাজা খুব লজ্জায় পড়ে কাঠের ঘোড়াটাকে বার করে দিতে বাধ্য হলেন। কাঠের ঘোড়া পেয়ে রাজকন্যা খুব খুশি। রাজকন্যা ও রাজপুত্র নিয়ে শোভাযাত্রা ফিরে চলল ভিনদেশের উদ্দেশে।

বেশ কয়েকদিন ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে তারা চলতে থাকল। চলতেই থাকল। প্রহরীরা সারাক্ষন নিশ্ছিদ্র পাহারা দিয়ে ঘিরে রাখত রাজকন্যা অলকনন্দা, রাজপুত্র দিগ্বিজয়কে। ফলে ওরা একটা মিনিটও ফাঁকা পেত না যে কাঠের ঘোড়ার পিঠে চড়ে উড়ে পালিয়ে যাবে। রাজপুত্র আগে থেকেই রাজকন্যাকে শিখিয়ে রাখল

–যখন আমরা ভিনরাজ্যের প্রাসাদে পৌঁছে যাব, তখন তুমি বলবে একমাত্র একটা শর্তেই তুমি গাড়ি থেকে নামবে। সাতটা বড় প্লেটে মোহর ভর্তি করে এনে তোমায় দিতে হবে। মোহর নিয়ে এলে তুমি প্লেট উলটে সব মোহর ফেলে দেবে রাস্তায়।

তারা যখন ভিনরাজ্যে এসে পৌঁছলো, তখন রাজকন্যা সেই পরিকল্পনা অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। লোকেরা রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে মোহর কুড়োতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অমনি রাজপুত্র রাজকন্যাকে নিয়ে চেপে বসল কাঠের ঘোড়ায়। আর খুব তাড়াতাড়ি একের পর এক স্ক্রু আলগা করে চোখের নিমেষে উড়ে

চলে গেল। সব লোকজন, অতিথি অভ্যাগত, রাজ্যবাসী শুধু তাকিয়ে দেখতেই থাকল। কেউ কিছুই করতে পারলেন না।

## ৯

রাজপুত্র দিগ্বিজয় রাজকন্যা অলকানন্দাকে নিয়ে নিরাপদে ফিরে এলো নিজের দেশে।

এপাশে রাজপুত্র কাঠের ঘোড়ায় চড়ে অদৃশ্য হওয়ার পর থেকেই রাজা প্রতাপাদিত্য খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন। সারা দিন-রাত রাজপুত্রের কথা ভেবে ভেবে অস্থির হচ্ছিলেন। তার সব রাগ গয়ে পড়েছিল ছুতোর মিস্ত্রীটার ওপর। সে কাঠের ঘোড়াটা না বানালে তো এমন কান্ড হতো না। তাই তিনি ছুতোর মিস্ত্রীকে শাস্তি হিসেবে একটা কাঠের সেতুতে আমৃত্যু বেঁধে রাখার আদেশ দিয়েছিলেন।

রাজপুত্রকে সুস্থ অবস্থায় দেশে ফিরে আসতে দেখে রাজার তো আনন্দ আর ধরে না। রাজপুত্র এসেই ছুতোরের তৈরী কাঠের ঘোড়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলল

-এই কাঠের ঘোড়াটা এত কাজের যে এই কদিনেই আমি পৃথিবীর অনেকগুলো নতুন দেশ দেখে এসেছি। এমনকি এমন সুন্দর এক রাজকন্যাকে খুঁজে বিয়েও করে এনেছি। তারপর দেশে নিরাপদে ফিরে আসতে পেরেছি। তুমি ছুতোর মিস্ত্রিকে খুব ভাল পুরস্কার দিও।

তখন রাজা তার কৃতকর্মের জন্যে খুব লজ্জিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠালেন ছুতোর মিস্ত্রীকে আনার জন্যে। রাজার লোকেরা সেতুর কাছে গিয়ে দেখল ছুতোর মিস্ত্রী তখনও বেঁচে আছে। তাকে সব বাঁধন মুক্ত করে নিয়ে এলো রাজপ্রাসাদে। রাজা তাকে অনেক অর্থ ও মনিমুক্ত দিয়ে পুরস্কৃত করলেন এবং রাজসভায় ভালো পদে নিযুক্ত করে সম্মানিত করলেন।

তারপর রাজ্যে বিশাল জাঁকজমক করে রাজপুত্র আর রাজকন্যার আরও একবার বিয়ে দেওয়া হল।

রুচিরা
বেইজিং, চীন

# ইচ্ছে মতন: আমার গরমের ছুটি

আমি মধুরিমা। এবারের গ্রীষ্মের ছুটি আমি একটু অন্যভাবে কাটিয়েছিলাম। প্রথমেই আমার স্কুলের রবীন্দ্র জয়ন্তীতে আমি নাচ করলাম। তারপর সত্যজিত রায় পার্ক থেকে আমাকে রবি ঠাকুরের জন্মদিনে গান গাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আমি "সুরের গুরু" গানটি গেয়েছিলাম। এবারে আমার মায়ের স্কুলে গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প হয়েছিল। সেখানে আমি নাচের ও ক্লে মডেলিং এর ক্লাস করেছিলাম। সেখানে মাটি দিয়ে নানারকমের পাখি, জন্তু আর অন্য অনেক জিনিষ তৈরি করেছিলাম। এছাড়া বি পি টাউনশিপের কো-অপারেটিভের ফোরাম, তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য, আমাকে নৃত্যে অংশগ্রহনের জন্য নির্বাচিত করে। আমি সেই অনুষ্ঠানে 'গীতাঞ্জলি' নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেই অনুষ্ঠানটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডঃ ত্রিগুনা সেন' হলে হয়েছিল। এছাড়া আমাদের বৈষ্ণবঘাটা উপনগরীতে প্রতিবছর লোকসংস্কৃতি মেলা বসে।সেখানে আমি গান ও নাচে অংশগ্রহণ করেছিলাম।

মাঝে মাঝে দুপুরবেলায় বসে অনেক ছবিও এঁকেছি। বিকেলবেলা বন্ধুদের সাথে খেলাধূলা করতেও ছাড়িনি। একদিন সব বাড়ির বন্ধুরা মিলে চাঁদা তুলে খাওয়া-দাওয়া করেছি। সব কিছুর মধ্যে পড়াশোনাও বাদ দিইনি। কারণ, ছুটির পর স্কুল খুললে আমার পরীক্ষা শুরু।

আঁকা ও লেখাঃ
মধুরিমা গোস্বামী
ষষ্ঠ শ্রেণী
ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল, পাটুলি

# বিদেশী রূপকথা: মোমোতারো

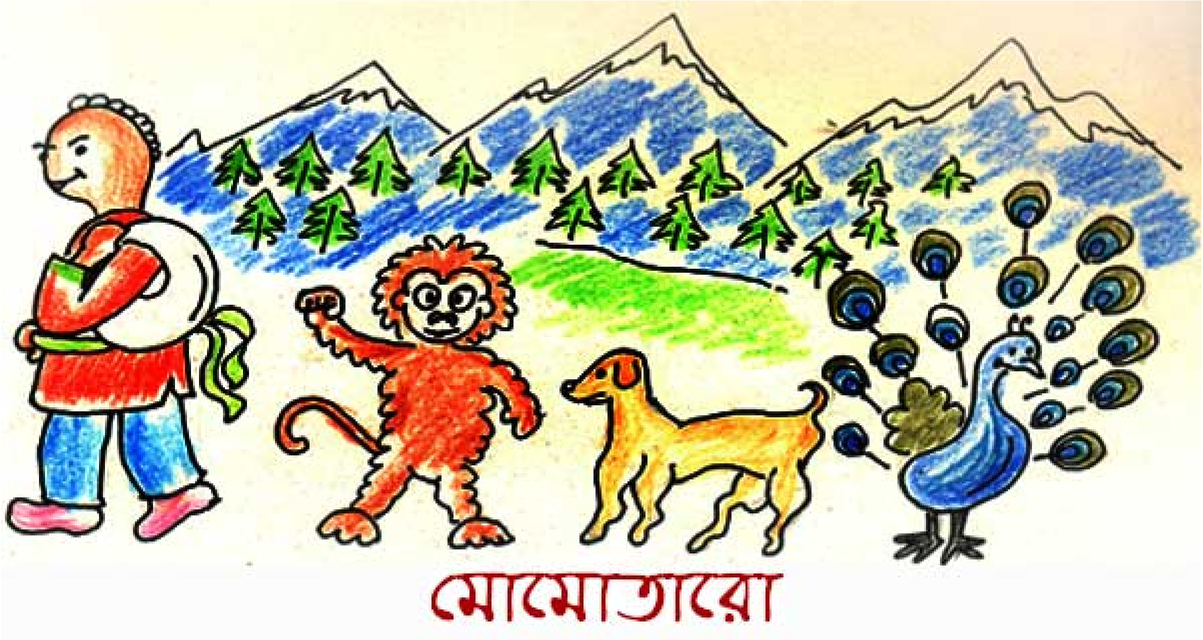

জাপানী রূপকথা

সে অনেক কাল আগের কথা। ছিল এক কাঠুরে আর তার বউ। তাদের অনেক বয়স হয়েছিল। একদিন কাঠুরে-বউ একগাদা জামাকাপড় নিয়ে যাচ্ছিল নদীর দিকে। নদীর জলে যত ময়লা ধুয়ে সাফ করবে বলে।

নদীর জলে চোখ পড়তেই দেখল মস্ত বড় একটা পীচফল জলে ভেসে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ির মনটা আনন্দে নেচে উঠল। মনে মনে বলল আজ রাতে তবে মিষ্টি এই ফল খেয়েই পেট ভরবে।- এই ভেবে সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর সেটা নিয়ে রাখল ডাঙায়।

জামাকাপড় ধুয়ে পীচফলটাকে কাঁধে চাপিয়ে সে এল বাড়িতে।

বুড়ো তো বুড়িকে দেখে অবাক! বলল, এটা আবার কোথা থেকে আনলে?

বুড়ি বুড়োকে বলল, এটা নদীতে ভেসে যাচ্ছিল, নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে নিয়ে এসেছি।
বুড়ো বলল, বাঃ আজ রাতে তবে ফল খেয়েই থাকতে পারব।

সন্ধে হল। রাত হল। এবারে খাওয়া দাওয়ার পালা। খাওয়া বলতে আজ সারাদিনে আর কিছুই তো ভাগ্যে জোটেনি, এই ফলটুকু ছাড়া।

একটা ধারালো ছুরি দিয়ে ফলটাকে কাটা হল। ফলটাকে কাটতেই দুজনে অবাক! এ যে বিশ্বাসই করা যায়না। একটা ছোট্ট ছেলে, খুবই ছোট্ট, ফলের মধ্যে কেমন ঘুমিয়ে আছে!

বুড়োর মুখে কথা নেই।বুড়ির মুখে কথা নেই।কিছুক্ষণ পর বুড়ো বলল, ছেলেটাকে ভাবছি ডাকব

মোমোতারো বলে।

বুড়ি বলল, বেশ ভালো নাম রেখেছ। আমরা ওকে কোলেপিঠে মানুষ করব। দেখবে ছেলেটা আস্তে আস্তে ঠিক বড়ো হবে।

দিন যায়। মাস যায়। মোমোতারো বড়ো হয়। দেখতে দেখতে মোমোতারো আরও বড়ো হয়ে উঠল। একদিন গম্ভীর গলায় সে তার বাবা-মাকে বলল, আমি এখন ওগরু দ্বীপে যাব। আমার জন্য কিছু গরম গরম পিঠে বানিয়ে দেবে কি?

মা বাবা তো ভেবেই অস্থির। বলল, সেখানে গিয়ে তুই কি করবি?

মোমোতারো বলল, শুনেছি সেখানে এক রাজা আছে। একবার রাজার কাছে যেতে দাও।আমি জানি সেখানে গেলেই আমাদের ভাগ্য খুলবে।

মা বাবা আর কি বলেন! শুধু যাবার সময় পই পই করে বললেন, ঠিকমতো রাস্তা দেখে চলবি। রাস্তায় যাকে পাবি মিষ্টি করে কথা বলবি। সে যদি খেতে চায় খেতে দিবি। ভাল ব্যবহার করবি। কাউকে দুঃখ দিবি না। কারো সঙ্গে বেইমানি করবি না। কখনও মিথ্যে বলবি না।

মোমোতারো মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে সব কথা শুনল, তারপর কাঁধে পিঠের ব্যাগ ঝুলিয়ে রাস্তার দিকে পা বাড়াল।

কিছুদূর যেতেই দেখা এক বানরের সঙ্গে। 'কিয়া' 'কিয়া' শব্দ করে বানরটা কাছে এসে বলল, মোমোতারো ভাই আমার, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

মোমোতারো যেতে যেতে বলল, আমি ওগরু দ্বীপে যাচ্ছি। শুনেছি সেখানে এক রাজা আছে। একবার রাজার কাছে যেতে দাও। আমি জানি সেখানে গেলেই আমাদের ভাগ্য খুলবে। জান তো, এতদূর যাব বলে আমার মা আমার জন্য গরম গরম পিঠে বানিয়ে দিয়েছে।

বানরটা বলল, যদি তুমি আমাকে একটা পিঠে খেতে দাও, আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি। মোমোতারো আর কি করে!সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটা পিঠে খেতে দিল। পিঠে খেয়ে বানর এবার মোমোতারোর সঙ্গে হেঁটে চলল।

অনেক দূর চলে এসেছে অমনি দেখা এক ময়ূরের সঙ্গে।'কেন' 'কেন' শব্দ করে ময়ূর কাছে এসে বলল, মোমোতারো ভাই আমার, এই অবেলায় যাচ্ছ কোথায়?

মোমোতারো যেতে যেতে বলল, আমি যাচ্ছি ওগরু দ্বীপে।শুনেছি সেখানে এক রাজা আছে। আমি জানি সেখানে গেলেই আমার ভাগ্য খুলবে। জানো তো, আমার মা আমার জন্য গরম গরম পিঠে বানিয়ে দিয়েছে।

ময়ূর বলল, যদি তুমি আমাকে একটা পিঠে খেতে দাও, আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি। মোমোতারো বলল, এটা আর বলতে! এই নাও পিঠে, এক্ষুনি চলে এসো।

পিঠে খেয়ে ময়ূর এবারে মোমোতারোর সংগে হেঁটে চলল।

এবারে কিছুদূর যেতেই 'ঘেউ' 'ঘেউ' শব্দ করে একটা কুকুর দৌড়ে এল। বলল, মোমোতারো কোথায় যাচ্ছ শুনি?

মোমোতারো যেতে যেতে বলল, আমি যাচ্ছি ওগরু দ্বীপে।জানো তো, আমার মা আমার জন্য গরম গরম পিঠে বানিয়ে দিয়েছে।

কুকুর বলল, যদি তুমি আমাকে একটা পিঠে দাও, তোমার সঙ্গে আমিও যেতে পারি। মোমোতারো বলল, বেশ তো, এই নাও পিঠে, খেতে খেতে চলো।

অনেক হাঁটাহাঁটির পর মোমোতারো এল ওগ্রু দ্বীপে। ওর সঙ্গে সঙ্গে এল বানর, ময়ূর আর সেই কুকুর। হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছোল রাজার বাড়ি।

ওগ্রু দ্বীপের রাজা মোমোতারো কে দেখে বলল, তোমার নাম কি বাছা? এখানে কেন এসেছ? মোমোতারো বলল, আমার নাম মোমোতারো। আমি এসেছি ওগ্রু দ্বীপের রাজার কাছে। মানে আপনার কাছে। লড়াই করব বলে।

রাজা মোমোতারোর সঙ্গী বানর, কুকুর আর ময়ূরকে দেখে অবাক হলেন। বললেন, আমি বুড়ো হয়েছি। লড়াই করে আর কাজ নেই বাছা। আমার ছেলেপুলে নেই। তুমি খুব বুদ্ধিমান আর শক্তিধর। তুমি এখানেই থেকে যাও। আমার পরে তুমিই এদেশের রাজা হবে।

মোমোতারো বলল, তা হয় না রাজামশাই। আমার দুঃখী মা-বাবা আমার পথ চেয়ে বসে থাকবে। সিংহাসনের চেয়ে আমার কাছে অনেক বড়ো আমার মায়ের কোল।

রাজা খুব খুশি হয়ে বললের, তোমাকে কিছু সোনাদানা উপহার দিচ্ছি। এই নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। সবাই খুশি হবে।

তখনই মোমোতারোর কাছে এসে পৌঁছোল এক বস্তা ভর্তি সোনারুপো হিরে আর জহরত। আর এল একখানা কোট, সঙ্গে নীলটুপি।

রাজা বললেন, শোনো, এই অদ্ভূত কোটটুপি পরলে তোমাকে কেউ দেখতেও পাবে না। বিপদে আপদে শুধু এই কোটটুপি ব্যবহার করবে। কারোর ক্ষতি করবে না।

মোমোতারো এত সব পেয়ে ভীষণ খুশি।

বস্তাভর্তি সোনারুপো কাঁধে ঝুলিয়ে, একহাতে কোটটুপি নিয়ে, সে ছুট দিল বাড়ির দিকে।

বানর, ময়ূর আর সেই কুকুরটাকেও সঙ্গে নিতে ভুলল না সে।

সুনির্মল চক্রবর্তী
জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল চক্রবর্তী ইচ্ছামতীকে উপহার দিয়েছেন এই জাপানি রূপকথাটি। এই গল্পটি পূর্বে অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে।

# আনমনে: আমার ছোট্টবেলাঃপর্ব ৮

পর্ব-৮

লিখছি বর্ষার কথা আর খাচ্ছি আম, লিচু, জাম--এই সব।তোমরাও নিশ্চয়ই মজা করে খাচ্ছ! তবে গরমখানা যা পড়েছে! সাবধানে থেক সবাই।

দেখ, এখন জৈষ্ঠ্য মাসের শেষের দিক। আজ কালের মধ্যেই বর্ষা আসার কথা। কিন্তু দেখছ'ত, তার আসার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নেই, ভ্যাপসা গরমে প্রাণ আইঢাই! আম পাকা গরম কিনা! অবশ্য এ লেখা যখন পড়বে তখন'ত সে এসে যাবেই, কদ্দিন আর না এসে পারবে!

চল আমার ছোটবেলার গ্রীষ্মবর্ষা দেখে নিই। গ্রীষ্ম দিয়েই শুরু করি,কি বল।

তোমরা যারা শহরে থাক তারা বোধ হয় কোকিলের ডাক শোন নি। কিন্তু গ্রামের ছোটরা চৈত্র-বৈশাখের রাতে এডাক নিশ্চয়ই শুনেছ,কি বল।

কতদিন 'চোখ গেল' বা 'বৌ কথা কও'-- এমন সব ডাক শুনে ঘুম ভেঙে যেত এই সময়!
গ্রীষ্ম নিয়ে কথা, সুতরাং কালবৈশাখীর কথা ত বলতেই হবে। কবিগুরুর 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটা পড়েছ ত? এ লাইনটা মনে কর-- 'সেই মনে পড়ে জৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম, অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।'

শুধু জৈষ্ঠ্য নয়, চৈত্র- বৈশাখেও ছিল একদম তাই। জৈষ্ঠ্যতে পাকা আম আর চৈত্র-বৈশাখে কাঁচা পাকা মিলিয়ে। সব সময়েই আম কুড়াবার ধুম! এখন ত ঝড় হতেই চায় না, কিন্তু সে সময় দু'একদিন পর পরই বিকেলের দিকে উত্তর-পশ্চিম আকাশ কালো করে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি ধেয়ে আসত, আর সংগে আসত ভয়ধরানো বজ্র-বিদ্যুত। ভয় পেয়ে দিয়ানির কোলে সেঁধিয়ে যেতাম। বাজ পড়ার সে ভয় আজ

বুড়ো হয়েও কাটে নি। দাদুর কথায় বুঝতে পারতাম যে তাঁরও চিন্তা থাকত ঘুর্ণিঝড় নিয়ে, কেন না এটা হলে প্রায়ই শোনা যেত কারও না কারও বাড়ির চালা উড়ে গেছে ঘুর্ণিঝড়ে আর না হয় বজ্রপাতে কারও অপমৃত্যু হয়েছে। সে যে কি ভয়ের কথা, তা বলে বোঝানো যাবে না।

ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেলে মেঘ উড়ে গিয়ে বিকেলের রোদ উঠে পড়ত। আর আমাদের শুরু হয়ে যেত আম কুড়াবার পালা! ধামা ধামা কাঁচা আম জড়ো হত। কি হত অত আম দিয়ে? দিয়ানি আর মামিমা সব আম কেটে রোদে শুকোতে দিতেন। শুকিয়ে কালো হয়ে কুড়মুড়ে হয়ে যেত আমের টুকরো গুলো, একে বলা হয় 'আমচুর', তোমরা বোধ হয় আমসি বল, তাই ত? পরে অবশ্য সেগুলো আর কুড়মুড়ে থাকত না। বর্ষা বা অন্য কোন সময় যখন আম থাকত না তখন আমের স্বাদ পাবার জন্য ঐ আমচুর ব্যবহার হত।

আমাদের পাঠশালার সামনে যে মাঠটা ছিল তাতে এই গরমের সময় খুব জমিয়ে ফুটবল খেলা হত, মানে একটা প্রতিযোগিতা হত। নানা জায়গা থেকে নানা দল খেলতে আসত। হারজিত নিয়ে যেমন হৈ হল্লা হত, তেমনি ঝগড়াঝাঁটিও চলত খুব।

জৈষ্ঠ্যের এই সময় প্রতিদিন বিকেলে জলখাবার কি খেতাম বলত? কাসুন্দি দিয়ে মাখা নানা ধরনের পাকা আম। দিয়ানির আম কেটে মাখা হয়ে গেলে মামারা কেউ হাঁক দিতেন আমার নাম ধরে। রান্নাঘরের পেছনেই ছিল পাঠশালা আর তার পরেই মাঠ। আমি ত কান খাড়া করে ডাকের অপেক্ষাতেই থাকতাম! কোন কোনও দিন কাসুন্দি দিয়ে জাম মাখাও থাকত তার সাথে। কাসুন্দি কাকে বলে জানত? বাজার থেকে নিশ্চয়ই কিনে আনেন বাবা, তাই না? কিন্তু আমাদের ছোটবেলায় ত কাসুন্দি বাজারে কিনতে পাওয়া যেত না কিনা, দিয়ানি বাড়িতেই বানাতেন। যাতে তাড়া তাড়ি সেটা খারাপ হয়ে না যায়,অনেক দিন ধরে খাওয়া যায়, সে জন্য অনেক নিয়ম মেনে শুদ্ধাচারে বানাতে হত।

আমের কথা বলছিলাম, সেটা বলি। কত রকম স্বাদের আম যে ছিল! আর তার কি বিচিত্র সব নাম! শুনবে নাকি কয়েকটা? ছোট তিল্যা, বড় তিল্যা (যে আমের গায়ে তিলের মত দাগ; তিল থেকে তিল্যা এসেছে), কানাই বাঁশি, পলান্যা(এ নামটা কেন হয়েছিল তা জানি না), গোপাল ভোগ, সিঁদুর্যা( পাকলে আমের রঙ সিঁদুরের মত রাঙা হত), চুকারি (এর কথা ত আগে বলেছি),ঝাঁপড়ি (এর আবার ছোট আর বড় দুটো গাছ ছিল)--এমন আরও কত নাম যে ছিল! সব মনে নেই। আম পাকতে শুরু করলে প্রতিদিন সকালের দিকে ফুলমামা আর সোনামামা হরিশদাকে নিয়ে আম পাড়তে বেরতেন। আমিও যেতাম সংগে। মামারা গাছে উঠতেন হাতে 'কোঁটা' (আঁকশি) নিয়ে আর আমরা নীচে আম কুড়োতাম।

ওঁরা গাছে উঠে পাড়তে পাড়তেই হাতের নাগালে থাকা আম পেড়ে খেতে শুরু করতেন। প্রতিদিনই বড় এক ঝুরি করে আম হত। রোজ দু'বেলা পেট ভরে খেয়েও অত আম শেষ করা যেত না, একে ওকে দিয়ে দেওয়া হত, আর না হয় আমসত্ব করতেন দিয়ানি। তোমরা যেরকম আমসত্ব কিনে খাও তেমন মোটা মত নয়, বাড়িতে বানান আমসত্ব পাতলা আর একটু কালচে মত হত, আর স্বাদটাও হত অনেক আলাদা। পাথরের থালা, কুলো বা পরিষ্কার কাপড়ের ওপর পুরু করে আমের রস ছড়িয়ে রোদে শুকোতে দিতেন দিয়ানি। প্রথম পরত শুকিয়ে গেলে তার ওপরে আর এক পরত ছড়ান হত। এভাবে

কয়েকবার করে, একটু পুরু হয়ে একেবারে শুকোনো হয়ে গেলে কাপড়ের মত ভাঁজ করে হাঁড়ির ভেতর রেখে দিতেন দিয়ানি। আমের দিন শেষ হয়ে গেলে আমের স্বাদ পেতে আমসত্ত্বের জুড়ি আর নেই। কাঁঠালের গাছও ছিল অনেককটা, তাদেরও নানা নাম ছিল। তাদের মধ্যে একটা গাছের কথা বেশ মনে আছে। সেটার নাম ছিল 'মাথাভাঙা'। সেটা যখন ছোট ছিল কোনও কারনে মাথাটা ভেঙে গেছিল, তাতেই ওই নাম।

গাছটা ছিল লম্বা শিড়িংগে মত। তাতে অসংখ্য ছোট বড় কাঁঠাল ধরত কান্ড বেয়ে--একেবারে গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত। অনেক সময় গোড়ার দিকের কাঁঠাল পাকলে রাতের আঁধারে শেয়ালে খেয়ে যেত। সোনামামা খেতে পারতেন খুব। অনেক সময় ওই গাছে চড়ে কাঁঠাল পাড়তে গিয়ে কোন পাকা কাঁঠাল হাতের কাছে পেলে সেখানে বসেই গোটাটা খেয়ে ফেলতেন। দাদু বা দিয়ানি দেখে বকাবকি করলে হো হো হেসে পাড়া কাঁপাতেন।

পাকা আমের যেমন রং ধরে, পাকা কাঁঠালের কিন্তু রং ধরে না।গন্ধে বোঝা যায় পাকল কিনা। তবে আমের মত পেকে মাটিতে পড়লে সেটা ছেতরে যাবে, খাওয়া যাবে না। তাই আধপাকা কাঁঠাল পেড়ে ঘরে রেখে পাকাতে হয়।

গাছে থাকা অবস্থায় হাত দিয়ে চাপড়ালে শব্দ শুনে বোঝা যায় আধপাকা হয়েছে কিনা আর নামানো যাবে কিনা। কাঁঠাল গাছ থেকে পেড়ে দাদুর ঘরের বারান্দায় সার দিয়ে রাখা হত বোঁটা থেকে আঠা ঝরে যাবার জন্য। এমন ভাবে রাখা হত যাতে আঠা মাটিতে পড়ে, বারান্দায় না পড়ে।

এর পর দেওয়া হত 'কচি'। নামটা অদ্ভুত মনে হচ্ছে ত! কি আর করা যাবে, যেমন নাম তেমনই ত বলতে হবে। আসলে কচি দেওয়ার অর্থ কাঁঠাল পাকাবার ব্যবস্থা করা।

বাঁশের একটা সরু বাখারিকে ফুটখানেক করে কেটে একটা মুখ ছুঁচল করা হত। ওই সরু মুখটা ঠুকে ঠুকে বোঁটার ভেতর দিয়ে কাঁঠালের ভেতরে অনেকটা ঢুকিয়ে দিয়ে একটা গর্ত করা হত। এবার ওই গর্তের মধ্যে ঠেসে ঠেসে ভরা হত নুন। এই অবস্থায় রেখে দিলে দু'এক দিনের মধ্যেই পেকে যেত কাঁঠাল।

আর পাকলেই চারদিক গন্ধে একেবারে ম ম! ঘন দুধ আর পাকা আম বা কাঁঠাল দিয়ে ভাত, একবার যে খেয়েছে সে ভুলতে পারবে না।

তোমরা আম দিয়ে দুধভাত নিশ্চয়ই খেয়েছ, কিন্তু কাঁঠাল দিয়ে খেয়েছ কি? না খেয়ে থাকলে মা'কে বলে দেখ না একবার।

কাঁঠাল খাওয়া মুশকিলই বটে! যা বড়, খেয়ে শেষ করা যায় না। তা ছাড়া আঠার ঝামেলাও কি কম?

কবিগুরুর আর একটি ছড়ার কথা মনে পড়ল, সেটা হল--
আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে।
হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,

পিঁপড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।।

বুঝতেই পারছ কেমন স্বাদ খাবারের! পিঁপড়ে কাঁদবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি!

আমি অবশ্য এতগুলো জিনিষ একসাথে দুধে ফেলে খাইনি, তবে আমসত্ব দুধে ফেলে খেয়েছি। আর আম কাঁঠালের কথা ত বলেইছি।

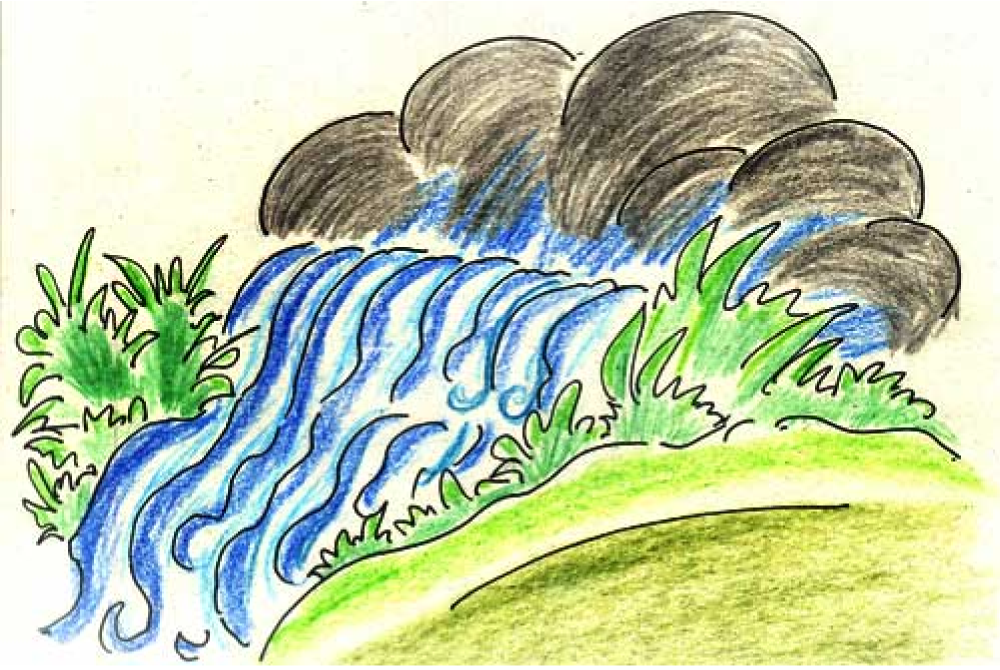

এই ভাবে গ্রীষ্ম শেষ হতে না হতেই হুড়মুড় করে বর্ষা এসে পড়ত। শুরু হয়ে যেত আর এক মজা। প্রচন্ড গরমের মাঝে একদিন দেখা যেত দক্ষিণ-পুর্ব আকাশে ঘন কাল মেঘ। ক্রমে সে মেঘ সমস্ত আকাশ ঢেকে ফেলত, শুরু হত প্রথমে টিপি টিপি, আর তারপর ঝমঝমিয়ে প্রবল বৃষ্টি। অত গরমের পর বৃষ্টি দেখে আনন্দে সবাই উঠোনে বেরিয়ে পড়তাম জলে ভেজার জন্য। দাদু-দিয়ানি বকাবকি শুরু করে দিতেন, পাছে জলে ভিজে অসুখ-বিসুখ করে। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

বর্ষার প্রাথমিক আনন্দ কেটে যাবার পর শুরু হয়ে যেত ঘ্যান-ঘ্যানানি বৃষ্টি, এতে খারাপ লাগলেও একটা ব্যাপারে খুব উতসুখ থাকতাম।

চারিদিকে শোনা যেত বন্যার খবর, এখন শুনতে খারাপ লাগে, কিন্তু সে সময়ে অতটা বুঝতাম না। বন্যার খবর পাওয়ার পরই উতসুক থাকতাম এই ভেবে কবে আমাদের দিকে ওই জল আসবে, আর বড় 'পাগারে' পড়বে!

'পাগার' কথাটার মানে ত' নিশ্চয়ই জান না। এর অর্থ হল একটা বড় ডোবার মত গর্ত। গ্রামের বাড়িঘর বন্যার জলের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বাড়ি তৈরীর সময় ভিটে উঁচু করতে হত। সে সময় কোন জায়গা থেকে মাটি কেটে নেওয়া হত। অনেক মাটি লাগত কিনা। তাই বড় বড় গর্ত তৈরী হয়ে যেত, তাদেরই কোনটার নাম হয়ে যেত 'বড় পাগার' আবার কারও নাম হত 'ছোট পাগার'।

বিশাল বড় নদী যমুনা খুব কাছে না থাকলেও ঐ নদীর জন্যই বোধ হয় বন্যা হত প্রতি বছর। বৃষ্টির জলে ওই নদী ফুলে ফেঁপে উঠে ভীষনাকার হয়ে যেত। উপচে পড়া নদীর জল ঢুকে পড়ত আশ পাশের ডাঙা জমিতে, গ্রামে-গঞ্জে। আমাদের গ্রামে আসত একটা নালা পথ দিয়ে যাকে বলে 'জোলা'। জোলাপথের থেকে পাগারগুলো সাধারনত একটু বেশী গভীর হয়। তাই জোলাপথের জল পাগারে পড়ার সময় জোর শব্দ হয় ঝরণার মত। সে শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা যায়।

কোন বছর সে শব্দ দিনে দুপুরে শোনা যেত, আবার পরের বারই হয়ত ঘুমভাঙা ভোরে শুনতে পেতাম। সে শব্দের অনুভুতি, আনন্দ তোমাদের বোঝান আমার কম্ম নয়।

এই খানে একটা কথা বলে নি। সেই যে আমার ঘুম ভাঙানোর কথা বলেছিলাম একেবারে শুরুতে-- সেই যে ঘুঘুর ডাক বা হেমন্তের ভোরের শিশিরের শব্দে ঘুম ভাঙার কথা, সে রকম বর্ষার কোন কোনও ভোরে ঘুম ভাঙত বৃষ্টির মিষ্টি শব্দে! টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার শব্দ ভারি মিঠে, তা সে ঝিরঝির করেই হোক আর মুষলধারেই হোক। এমন শব্দ শুনেছ কখনও? কেউ কেউ শুনে থাকতে পার যারা টিনের চালওয়ালা বাড়িতে থাক।

যে কথা বলছিলাম।

পাগারে জল এলেই গ্রামের সব ছেলেরা, এমনকি বড়রাও, এসে ভিড় জমাত পাগারের ধারে। অতি উতসাহে ছোটরা কেউ কেউ আবার নেমে পড়ত জলে, বার বার সাঁতরিয়ে এপার ওপার করত। আমি সাঁতার জানতাম না বলে আমার জলে নামা প্রায় নিষিদ্ধই ছিল। এছাড়াও ছিল নতুন জলে স্নান করে অসুখ-বিসুখ হওয়ার ভয়ও।

বন্যার জল ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে সমস্ত ডাঙা জমি ডুবিয়ে দিত। চারিদিক জলে জলময় হয়ে যেত, উঁচু ভিটেওয়ালা বাড়িগুলো জলের মধ্যে দ্বীপের মত দাঁড়িয়ে থাকত শুধু।

খেলা ধুলা, পাঠশালা, বন্ধুদের সাথে দেখাশোনা সব বন্ধ একদম। বড়রাই শুধু নৌকা করে এখানে ওখানে যাওয়া আসা করতেন।

যাদের নৌকা ছিল না তারা বানিয়ে নিত কলাগাছের ভেলা। চার পাঁচটা কলা গাছ পাশাপাশি রেখে আড়াআড়ি দু'তিন জায়গায় বাঁশ বেঁধে নিলেই হয়ে যেত ভেলা। দু'একজন মানুষ সহজেই যাতায়াত করতে পারত।

বাড়ির দক্ষিন দিকে একটা স্বর্নচাঁপার গাছ ছিল। একটা দুটো কালবৈশাখী হয়ে গেলেই গাছ ফুলে ফুলে ভরে যেত। আর বর্ষায় সংখ্যাটা দ্বিগুন হত, আর তার গন্ধে চারি দিক ম ম করত। গন্ধরাজ ফুলও চাঁপার সাথে পাল্লা দিয়ে একই কায়দায় ফুটত।

ওর পাশেই ছিল একটা কদম ফুলের গাছ, শ্রাবণ মাসে ফুটত কদম ফুল, গাছ ভরে। ভারি সুন্দর দেখতে ছিল ফুলগুলো, আর কি তার মাতাল করা গন্ধ!

বর্ষার জল পেলে বা তারও আগে থেকে বাগানের মাটি ফেটে বেরত ভুঁইচাঁপা ফুল। হ্যাঁ, ফুল আগে ফুটত, তারপর গাছ বেরত।

আরও নানা ধরনের লিলি ফুলের গাছ ছিল বাগানে, কত তার রঙ, কত তার গন্ধ! জোলার পথে যেখান দিয়ে জল ঢোকে তার মুখে বাঁশের একটা ত্রিকোনাকার ফ্রেমের মত বানিয়ে তাতে বাঁধা হত খুব বড় মাছধরা জাল। বাঁধত জেলে ভাইয়েরা। এর নাম ছিল 'খরাজাল'। স্রোতের টানে ছুটন্ত জলে থাকা মাছেরা সব আটকে যেত জালে। নানা ধরনের ছোট বড় মাছ ধরা পড়ত, মামারা কিনে আনতেন মাঝে মাঝে।

জেলেভাইরা নানা রকমের জাল ব্যাবহার করতেন মাছ ধরার জন্য। টানা জাল, খ্যাপলা জাল- এমন সব নাম ছিল জালের। সব মনে নেই।

অনেক সময় মাছ কিনতেই হত না, কেননা মামারা নানা কায়দায় মাছ ধরতেন নিজেরাই। সে সব বলি দু'একটা। প্রথমেই বলতে হয় 'দোয়ার'-এর কথা। এটা ছিল বিশেষভাবে তৈরী একটা খাঁচার মত, বাঁশের সরু সরু কাঠি দিয়ে তৈরী। ভেতরে যাবার রাস্তা থাকে, কিন্তু বেরোবার রাস্তা মাছেরা খুঁজে পায় না, এমন ভাবে বানানো সেটা। খাবারের লোভে একবার ভেতরে ঢুকলে মাছ আর বেরতে পারে না। হ্যাঁ, খাবার ত দিতেই হত। ধান গাছের মধ্যে থাকত ফড়িং এর মত এক ধরনের পতংগ। সেগুলোই ছিল মাছেদের খাবার। যেখানে জলের স্রোত আছে এমন জায়গায় দোয়ার পাতা হত। সন্ধ্যাবেলায় পাতা হলে পরের দিন ভোরে অনেক মাছ পাওয়া যেত। সবই ছোট মাছ।

বড় মাছ ধরার জন্য ছিল 'জেয়ালা' দেওয়া। এটা একটা মাছধরা ছিপই, তবে তার হাতলটা ছিল মোটা কঞ্চি বা বাঁশের ডগা দিয়ে বানানো আর সুতোও ছিল বেশ মোটা। আর বঁড়শিটা? সেটাও ছিল বড়সড়, যাতে আর, বোয়াল বা রিঠার মত বড় মাছেরা টোপ গিলতে পারে।

তার টোপ ছিল কি বলত? একটা আস্ত জ্যান্ত ব্যাঙ বা ছোট মাছ! এর পিঠে বঁড়শি গেঁথে ছিপটা গাড়া হত মাটিতে এমনভাবে, যাতে ব্যাঙ বা মাছ জলের ঠিক ওপরে ভেসে ছটফট করতে থাকে আর জলে খলবল করে আওয়াজ তোলে।

বুঝতেই পারছ অল্প জলেই বড় মাছ ধরার জন্য এই জেয়ালা দেওয়া হত। অল্প জল না হলে মাটিতে ছিপ গাড়া হবে কি করে বল? জ্যান্ত ব্যাঙ বা মাছের শব্দ পেয়ে বড় মাছেরা এসে খপ করে টোপটা গিলে ফেলত বঁড়শি শুদ্ধ। সন্ধ্যায় পেতে রাখলে সকালে প্রতিদিনই কোন না কোনও মাছ ধরা পড়ত। বড়মামা আর ছোটমামা ছিপে মাছ ধরতেন। বর্ষার শুরুতেই তৈরী হত সেই ছিপ।আমাকেও দিতেন একটা ছোট ছিপ, ছোট মাছ ধরার জন্য। বঁড়শিতে কেঁচো গেঁথে ছিপ ফেললে একটু পরেই ফাতনা নড়ে উঠত, আর মওকা বুঝে টান মারতেই উঠে পড়ত মাছ- ট্যাংরা, পুঁটি বা চ্যালা-- এমন মাছই উঠত সব।

ফুলমামা আর সোনামামা আবার গামছা দিয়েও মাছ ধরতেন! কিভাবে বলত? বর্ষায় অনেক মা মাছই ছোট ছোট অসংখ্য বাচ্চা নিয়ে জলে ভেসে বেড়ায়। মামারা দুজনে আড়ি পেতে থেকে সেরকম মাছ গামছা দিয়ে ছেঁকে তুলতেন।একবার এমন করে মাছ ভেবে ব্যাঙের বাচ্চা তুলে দাদুর কাছে খুব বকুনি খেয়েছিলেন মামারা। ব্যাঙাচিরা অবিকল মাছের বাচ্চার মত দেখতে কিনা!

মাছ ধরা ছাড়া মামাদের কি আর কোনও কাজ ছিল না? থাকলেই বা কি! নৌকা ছাড়া ত কোথাও যাওয়া যেত না, তাছাড়া তাওত মোটে একখানা! একজন নিয়ে বেরিয়ে গেলেই হল আর কি!

চারিদিকে এমন জল দেখতে দেখতে শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম।

দাদুও মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়তেন মাছ ধরতে, অবশ্যই নৌকা নিয়ে। আমাকে ডেকে নিতেন মাঝে মাঝে। হরিশদা নৌকা বাইত।

ধানক্ষেতের মজা কি বলত? জল দাঁড়িয়ে যত উঁচু হত, ধান গাছগুলো তত বাড়ত। দাদু হরিশদাকে ধানক্ষেতের মধ্যে নৌকা নিয়ে যেতে বলতেন। দাদুর হাতে থাকত একটা অস্ত্র যা দিয়ে মাছ ঘায়েল করা যায়। তার নামটা হল 'কোঁচ'। এমন নাম শুনেছ কখনও? অদ্ভুত না?

এটা দেখতেও অদ্ভুত। একটা লম্বা বাঁশের ডগায় ঝাঁটার মত করে আঙুলের মত মোটা মোটা আটদশটা লাঠি বাঁধা। লাঠির মাথায় আবার বর্শায় যেমন থাকে তেমনি লোহার সরু সরু ফলা লাগানো। লাঠির ডগা গুলো আবার গোলাকার করে ছড়ানো থাকে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন লম্বা হাতলওয়ালা একটা বিরাট ঝাঁটা।

ধানক্ষেতের মধ্যে ঢুকে খুব ধীরে ধীরে নৌকা চালাত হরিশদা যাতে শব্দ না হয়, আর তীক্ষ্ণ নজর রাখত ধানগাছগুলোর দিকে। দাদুও খুব নজর করতেন। কি দেখতেন বলত? কোনও গাছ নড়ছে কিনা!

গাছ নড়া মানেই হল ওর গোড়ায় কোনও মাছ আছে। গাছের গোড়ায় জমে থাকা প্রিয় খাবার শেওলা খাচ্ছে। হরিশদা দেখতে পেলে ইশারা করত দাদুকে বা তিনি নিজে দেখতে পেলেও, কোনও শব্দ না করে ছুঁড়ে মারতেন কোঁচখানা। অতগুলো বর্শা কিনা, একটা না একটা মাছের গায়ে বিঁধে যেতই। সেখানা বিঁধে গিয়ে মাছ ছটফট করত। মাছ গেঁথেছে বুঝলে হরিশদা ঝাঁপিয়ে পড়ত জলে আর তুলে আনত মাছটা কোঁচ থেকে ছাড়িয়ে। এভাবে অনেক বড় বড় মাছ ধরতে দেখেছি।

কোনও দিন শুধুই নৌকা করে ঘুরতে যেতেন দাদু অনেক দূরে দূরে। একদিনের কথা মনে আছে। এক চাষিভাইয়ের বাড়ির কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দাদু তার নাম ধরে হাঁক পাড়লেন। সে এলে হাঁসের ডিমের দাম জিজ্ঞেস করলেন। টাকায় বিশটা না আঠারটা, তা নিয়ে বিস্তর দর কষাকষি হয়েছিল সেদিন। শেষ পর্যন্ত টাকায় বিশটা রফা হয়েছিল।

খুব অবাক হচ্ছ হয়ত, কিন্তু তখন একটাকা রোজগার করতে কালঘাম ছুটে যেত! টাকার দাম এখন কমে গেছে, তাই এখন একটা হাঁসের ডিমের দাম টাকা পাঁচেকের মত বোধ হয়!

পাট কি তা নিশ্চয়ই জান। ওখানে অনেক পাট চাষ হত। খুব সম্ভব বর্ষার শেষের দিকে পাট বড় হয়ে গেলে, সেটা কাটা হত। পাট কেটে আঁটি বেঁধে বেঁধে, সেই আঁটি গুলো জলে ডুবিয়ে পচানো হত। পাটকাঠি দেখেছ ত? খুব হালকা। পাট গাছগুলোও হালকা। জলে ডুবতে চাইত না। অনেকগুলো আঁটি পাশাপাশি জলে ভাসিয়ে তার ওপর বাঁশ বা গাছের ডাল-- এই সব চাপিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া হত।

ক'দিন পর জলে ডুবে থেকে গাছগুলো পচে গিয়ে ভারি দুর্গন্ধ ছড়াতো। হরিশদা, আর আরও অনেকে ওই পচা গাছ থেকে পাটের আঁশ ছাড়াতো। পাটগাছের ছালটাই হল পাটের আঁশ। ছাল ছাড়াবার পর যেটা পড়ে থাকে, সেটাই হল পাটকাঠি। জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করতে হত এসব। দিনভোর কাজ করত ওরা। কি কষ্ঠ বল! পাট ছাড়িয়ে গোছা বেঁধে বেঁধে কাপড় মেলার মত করে রোদে শুকতে দিত ওরা।

শ্রাবনের শেষের দিকে জলটা বেড়ে গিয়ে কেমন যেন শান্ত হয়ে যেত, জলে ভেসে আসত নানা ধরনের জলজ গাছ আর শেওলা। অদ্ভুত দেখতে সে সব। আর ছিল কচুরীপানা। তাতে ফুটে থাকত অজস্র হালকা নীল রঙের ফুল। দূর থেকে ভারি ভাল লাগত দেখতে। এটা কি জান যে কচুরীপানার ফুলের ব্যাসনভাজা খাওয়া যায় আর সেটা সুস্বাদু? ঘাটে নৌকা বাঁধা থাকলে তার গলুইয়ের ওপর উপুর হয়ে শুয়ে শুয়ে এই সব দেখতাম। একদিনের কথা খুব মনে আছে। জলে পচে মরে যাওয়া একটা ঝোপের একটা কাঠি কি করে যেন জলের ওপর সোজা দাঁড়িয়ে ছিল আর একটা ফড়িং সেই কাঠিটার মাথায় বসার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। একবার করে বসছে আবার পরক্ষণেই উড়ে যাচ্ছে! কিছুতেই আর বসা হচ্ছিল না! এরকম ভাবে কতবার আর কতক্ষণ যে করেছিল সে বলতে পারব না। শেষে আমিই অধৈর্য্য হয়ে সেখান থেকে চলে গেছিলাম!

আশ্বিনে, কোন কোনও বার ভাদ্রের শেষের দিকে, জল নামতে শুরু করত। তখন বাড়ির পেছন দিকের জমিতে জল কমে যেত। এখানে নৌকা বাঁধা থাকত অনেক সময়। একদিন সাহস করে দড়ি খুলে হাতে ছোট একখানা লগি নিয়ে নৌকা বাইবার চেষ্টা করেছিলাম। দু'এক বারের চেষ্টায় পেরেছিলাম নৌকা চালাতে। দেখলে মনে হতে পারে এটা সোজা কাজ, কিন্তু মোটেই সহজ নয়। ভারি শক্ত নৌকা বাওয়া। দাদু কিন্তু সেদিন দেখেছিলেন, তবে কিছু বলেন নি। কেন বল দেখি?

তোমাদের মত ছোটরা এটা কখনও না কখনো নিশ্চয়ই ভাব, 'ধ্যাত, কিচ্ছু ভাল লাগে না। কবে যে বড় হব!' কোনও সময় হয়ত বড়দের মত কোন কাজ করেও ফেল সাহস করে। বাবা-মা সেটা দেখেও না দেখার ভান করেন। কেন বল দেখি? কারন তাঁরা জানেন, তোমাদেরও ত বড় হয়ে একা একাই সব কাজ করতে হবে একদিন!

আমার দাদুও একই কারনে কিছু বলেন নি, কেন না আমাকেও কোন দিন নৌকা বাইতে হতেও ত পারে একা একাই!

অবশ্য তেমন কাজ করতে হয় নি। কলকাতায় আর নৌকা বাইব কি করে?

ঠিক ধরেছ! আমার যখন বছর দশেক বয়স তখন এমনই এক শ্রাবণ মাসের থৈ থৈ জলের মধ্যে

নৌকা করে মা ভাই বোনেদের সাথে পাড়ি জমিয়েছিলাম কলকাতার উদ্দেশ্যে। আর কোনদিন ফিরে যেতে পারিনি মামাবাড়ির গ্রামে, অথবা পাবনা শহরে।

অনেক কিছু লেখা হল, আবার অনেক কিছুই লেখা হল না। কিন্তু কি আর করা যায়। একদিন ত থামতেই হয়। তাই না?

(সমাপ্ত)

সন্তোষ কুমার রায়,
রুপনারায়নপুর।

# মনের মানুষ: সুকুমার রায়

সুকুমার রায়

আচ্ছা, সেদিন তুমি যখন বাবার কাছে বকুনি খেয়ে মুখ গোমড়া করে বসে ছিলে, তখন কি মা তোমাকে আদর করে গাল টিপে বলেছেন –'গোমড়াথেরিয়াম' বা দিদি তোমাকে আরো রাগিয়ে দিয়ে বলেছে 'রামগড়ুরের ছানা'? বলেনি? আচ্ছা, সে নাহয় নাই বা বলল, কিন্তু তুমি এখন কি ভাবছ – গোমড়াথেরিয়াম মানে কি? আরে, গোমড়াথেরিয়াম হল এমন এক প্রানী, যে কিনা সব সময় মুখ গোমড়া করে থাকে! তার খবর আমরা জানতেই পারতাম না, যদি না প্রফেসর হেঁশোরাম হুঁশিয়ার তাঁর ডায়রিতে তার সম্পর্কে লিখে রাখতেন। আর প্রফেসর হুঁশিয়ার সম্পর্কেই বা জানলাম কি করে?

– তারঁ সম্পর্কে আমাদের জানালেন তিনি, যিনি আমাদের সাথে আরো পরিচয় করালেন সব নানারকম মজাদার চরিত্রের – হাঁসজারু, বকচ্ছপ, কাঠবুড়ো, কুমড়োপটাশ, কাক্কেশ্বর কুচকুচে, ন্যাড়া আর অবশ্যই সেই খুব দুষ্টু ছেলে দাশুর। তুমি এদের কাউকে কাউকে, বা সবাইকেই হয়ত চেন। যদি চেন, তাহলে তো জানই এদের স্রষ্টার নাম। আর যদি নিতান্তই না জান, তাহলে, বলি, এইসব অদ্ভুত নামের চরিত্রগুলির সৃষ্টিকর্তা ছিলেন –সুকুমার রায়। তিনি, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির বড়ছেলে, সত্যজিত রায়ের বাবা, লীলা মজুমদারের বড়দাদা।

সুকুমার ছিলেন ছয় ভাই বোনের মধ্যে মেজ। তার আগে ছিলেন তার দিদি সুখলতা। ছোটবেলায়, ছয় ভাই বোনের মধ্যে সুকুমার, যার ডাক নাম ছিল তাতা, সে ছিল সবথেকে হই হুল্লোড়ে। সব ভাই বোনেদের নিয়ে নানারকম মজার মজার খেলা আবিষ্কার করত সে। তার বাবা উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন ভারতীয় মুদ্রনশিল্পের জনক। তাদের বাড়ি থেক প্রকাশিত হত ছোটদের জন্য রঙিন মাসিক পত্রিকা – সন্দেশ। বড় হওয়ার পরে, বাবার ইচ্ছায়, সুকুমার বিলেত যান মুদ্রনশিল্প এবং ফটোগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা করতে। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি ইউ রায় অ্যান্ড সন্স এর কাজকর্ম দেখতে শুরু করেন।

এই সব কিছুর মধ্যেই চলতে থাকে লেখালিখি। সুকুমার শুধু মজার মজার কবিতা ও গল্প লিখতেন না,

তার সাথে সাথে আবার সব মজাদার চরিত্রগুলির ছবিও আঁকতেন। সেইসব কবিতা গুলি সেইসব মজাদার ছবির সাথে ছাপা হত।

এই সব মজাদার, উদ্ভট, আজগুবি, অসম্ভব কবিতাগুলিকে একসাথে করেই প্রকাশ করা হয়েছিল 'আবোল তাবোল'। 'আবোল তাবোল' যদি এখনও না পড়ে থাকো, তাহলে শিগগির পড়ে ফেল।

আরেকটা মজার বই হল হ-য-ব-র-ল। হ-য-ব-র-ল এর মত আজগুবি কিন্তু মজাদার গল্প আর দুটো হয়না। এই গল্পে নানারকম পাখি এবং পশুরা কথা বলে, এবং নানারকমের অসম্ভব ঘটনা ঘটায়। এই বইয়ের বিভিন্ন চরিত্র গুলির মধ্যে কাক্কেশ্বর কুচকুচে ব্যা-করণ সিং বি এ, খাদ্যবিশারদ, ন্যাড়া, হিজিবিজবিজ - এদের নাম তো করতেই হয়।

পাগলা দাশুর গল্প পড়েছ কি? যদি না পড়ে থাক, তাহলে আর দেরি না করে পড়ে ফেল। দাশু এক খুব মজাদার চরিত্র। সে ইশকুলে এমন এমন সব কান্ড ঘটায়, যে হেডস্যার পর্যন্ত মাঝে মাঝে ভেবে পান না দাশুকে বকবেন কি ছেড়ে দেবেন! কেউ কেউ বলে, দাশুটা একটা পাগল ছেলে; কেউ বলে, না, ও আসলে একটা দুষ্টু ছেলে; এদিকে তাই বলে ভেব না, দাশুর মাথায় বুদ্ধি নেই; দাশু কিন্তু মাঝে মধ্যে পড়াশোনাটাও বেশ মন দিয়ে করে। পাগলা দাশু পড়ার পর দেখবে, দাশুকে খুব চেনা চেনা লাগছে। কেন বলতো? কারন, ভাল করে ভাবলেই বুঝতে পারবে, তোমার ক্লাসের কোন একটা বন্ধুর সংগে দাশুর ভারি মিল! কোন বন্ধুটা, সেটা অবশ্য তোমাকে খুঁজে নিতে হবে।

ছোটদের মধ্যে তিনি বিলিয়েছিলেন অনাবিল হাসি আর স্ফূর্তির খোরাক। তাই বলে ভেব না, খালি হাসি-মজার গল্পই লিখতেন তিনি। দেশ বিদেশের নানারকমের আবিষ্কারের গল্প, মনিষিদের গল্প, রূপকথার গল্প, সরস ভাষায় ছোটদের জন্য লিখতেন তিনি। শুধু ছোটরা কেন, বড়রাও পেত তাদের ভাগের হাসির খোরাক। তাঁর বন্ধুদের নিয়ে তিনি প্রথমে গঠন করেছিলেন 'ননসেন্স ক্লাব', এবং পরে 'মন্ডা ক্লাব'; সেই দলের সদস্যরা সোমবার (অর্থাৎ মনডে) একসঙ্গে দেখা করতেন, দেশ-সাহিত্য-সমাজ-শিল্প- এইসব বিষয়ে নানা রকম গুরুত্বপূর্ন আলোচনা করতেন আর প্রচুর হই-হুল্লোড় খাওয়া দাওয়া করতেন। এই সংগঠন গুলিতে যোগ দিয়েছিলেন সেই সময়ের প্রচুর বিখ্যাত মানুষ।

এত আনন্দ যিনি অকাতরে বিলিয়েছিলেন, আমাদের সেই মনের মানুষটি কিন্তু আমাদের ছেড়ে চলে যান খুব অল্প বয়সে। সেই সময়ে কালাজ্বর নামে এক অসুখ হত, যার কোন ওষুধ তখনও আবিষ্কার হয়নি। সেই কালাজ্বরের প্রকোপে, মাত্র ৩৯ বছর বয়সে, আঁকতে আঁকতে, লিখতে লিখতে, গল্প বলতে বলতে, আশেপাশের সব মানুষকে ছেড়ে চলে যান সুকুমার রায়। কিন্তু আমাদের জন্য রেখে গেছেন মন ভাল করা গল্প-কবিতা-নাটকের এক বিশাল ভাণ্ডার। তোমার - আমার সবার জন্য।

মহাশ্বেতা রায়
কলকাতা

ছবিঃ
উইকিপিডিয়া

# পড়ে পাওয়া: চীনে-পটকা

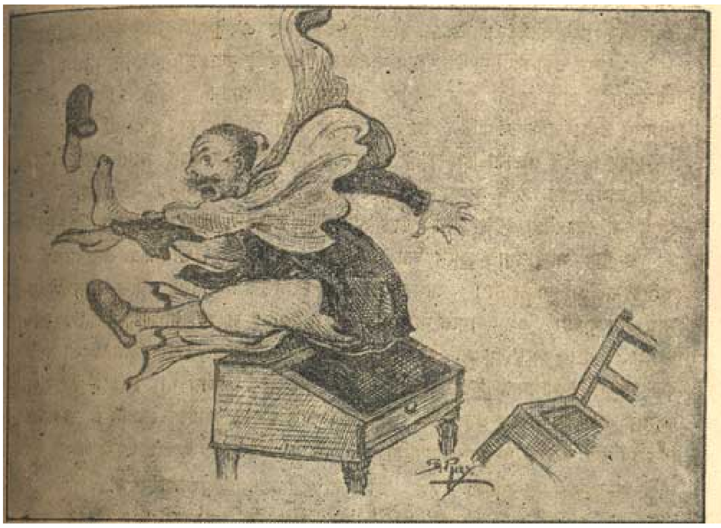

আমাদের রামপদ একদিন এক হাঁড়ি, মিহিদানা লইয়া স্কুলে আসিল! টিফিনের ছুটি হওয়া মাত্র আমরা সকলেই মহা উতসাহে সেগুলি ভাগ করিয়া খাইলাম। খাইল না কেবম 'পাগলা দাশু'।

পাগলা দাশু যে মিহিদানা খাইতে ভালোবাসে না, তা নয়। কিন্তু, রামপদকে সে একেবারেই পছন্দ করিত না- দুজনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া চলিত! আমরা রামপদকে বলিলাম,"দাশুকে কিছু দে!" রামপদ বলিল," কি রে দাশু, খাবি নাকি? দেখিস, খাবার লোভ হয়ে থাকে তো বল আর আমার সঙ্গে কোনদিন লাগতে আসবি নে- তাহলে মিহিদানা পাবি। " এমন করিয়া বলিলে তো রাগ হইবারই কথা, কিন্তু দাশু কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে হাত পাতিয়া মিহিদানা লইল, তার পর দারোয়ানের কুকুরটাকে ডাকিয়া সকলের সামনে তাহাকে সেই মিহিদানা খাওয়াইল! তারপর খানিকক্ষণ হাঁড়িটার দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে স্কুলের বাহিরে চলিয়া গেল। এদিকে হাঁড়িটাকে শেষ করিয়া আমরা সকলে খেলায় মাতিয়া গেলাম- দাশুর কথা কেউ আর ভাবিবার সময় পাই নাই।

তারপর কি হল? দাশু রামপদ'র মিহিদানার হাঁড়িটাকে নিয়ে কি করেছিল? ইস্কুলে সেদিন কি ভয়ানক কান্ড হয়েছিল? জানতে হলে পড়ে ফেল 'সুকুমার সমগ্র রচনাবলী' থেকে 'চীনে পটকা' নামের ইশকুলের গল্পটা।

সুকুমার সমগ্র রচনাবলী
তুলি-কলম

ছবিটি নেওয়া হয়েছে সুকুমার সমগ্র রচনাবলী থেকে।

# দেশে-বিদেশে: সবরমতীর সাধুর আশ্রমে

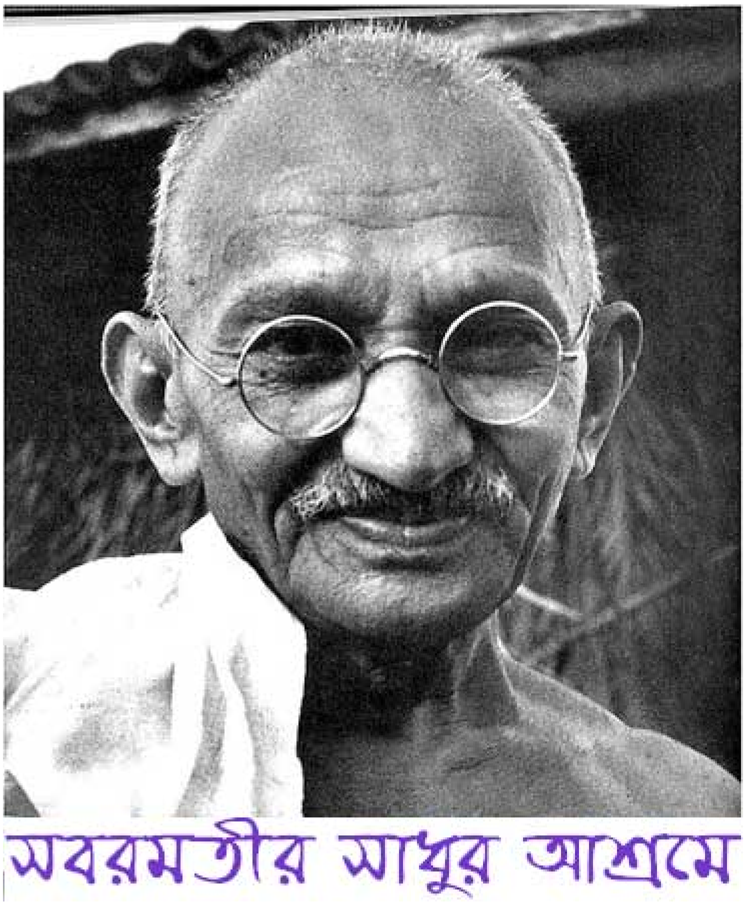

ছোট্ট বন্ধুরা, আমার সবসময় মনে হয় কোনো একটা জায়গা ঘোরা মানে তো শুধু ওই জায়গাটা ঘুরে চলে আসা নয়;তার মানুষ,আশপাশ,রাস্তার অলি গলি, বাসের হর্ণ,রিক্সার প্যাঁক প্যাকঁ, বড় বড় বাড়ী, ছোট ছোট বস্তি সব মিলিয়ে পুরো শহরটাকে দেখা আর দেখতে দেখতে উপলব্ধি করা যে জায়গাটা ঘুরবো তার ব্যপারে। একটা কথা বলবো তোমাদের চুপি চুপি,বেড়াবার সময় শুধু বাবা মায়ের হাত ধরে জায়গাটা দেখেই চলে এসো না, জায়গাটা নিয়ে আগে থেকে একটু পড়ে,শহরটাকে ভালো করে চেয়ে দেখবে আর ভাববে কত কি আলাদা দেখছো তোমার রোজকার জীবন থেকে।এটাই কিন্তু ঘোরার আনন্দ।না হলে গেলাম, দেখলাম, চলে এলাম আর লোককে বলে বেড়ালাম এই এই ঘুরেছি এতে তোমাদের কিন্তু কিছু লাভ হবে না।যাই হোক এবার আমার একটা সেদিনের ঘোরার গল্প তোমাদের বলি।আমেদাবাদে গেছিলাম কাজে।কাজের ফাঁকে সবরমতী আশ্রম দেখার জন্য লোকজনকে জিজ্ঞেস করে একটা সরকারী বাসে চড়ে বসলাম।বাসের মধ্যে দেখি দেহাতী এক গুজরাতী বয়স্ক মহিলা যার নাকে পেল্লায় নথ আর মুখে কোঁচকানো চামড়া ওই কোনের সিটে বসি গান গাইছে আবার সামনের সিটে সাদা ফটফটে আধা-ধুতি আর চাপকানের সাথে মানান্সই সাদা পাগড়ী আর সাথে আবার তাগড়াই সাদা ইয়াব্বড় গোঁফের রাজস্থানী বৃদ্ধ ছোকরা কন্ডাক্টরের সাথে গল্প জুড়েছে;আরো ছড়ানো ছেটানো নানা মানুষ এদিকে ওদিকে তবে অনেক সিটই ফাঁকা।বাসের জানলা দিয়ে ফুরফুরে হাওয়া ঢুকছে।বাস চলতে লাগলো ঝমঝমিয়ে। বাসে যেতে যেতেই দেখছিলাম,আমেদাবাদ শহরটা খুব একটা ঘিঞ্জি

নয়,ভেতরের পুরোনো আমেদাবাদের কিছু অংশ ছাড়া।বেশ ফাঁকা ফাঁকা।প্রত্যেক বাড়ীতে দোলনা।এটা বোধহয় গুজরাতিদের বাড়ীর বৈশিষ্ট্য।এখানকার মাটিতে বালি আর মাটির মিশ্রন আছে মনে হলো,গাছপালাগুলো অতিসবুজ নয়, একটা রুক্ষতা আছে কিন্তু শহরটাকে এরা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে; ৪১ ডিগ্রী টেম্পারেচারেও বাস-জানলার ফুরফুরে হাওয়া সেই মুহূর্তে আমাকে বারবার ভাবাচ্ছিলো আমি যাচ্ছি সেই সবরমতী আশ্রম যেখানে ভারতের সবচেয়ে আলোচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবনের অনেকটা সময় নিজেকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য কাটিয়ে গেছিলেন।

বাইরে থেকে ভীষনই সাদামাটা দেখতে এই আশ্রম। গেট দিয়ে ঢুকে আশ্রমের প্রথমেই মিউজিয়ম যার মধ্যে গান্ধীজীর আশ্রমবাসকালীন নানা ফটোগ্রাফ,চিঠিপত্র,আশ্রমের নিজস্ব পত্রিকায় গান্ধীজীর লেখা, আশ্রমে ব্যবহৃত নানা রকম চরকা, ডান্ডি অভিযানের ঘটনাকে লক্ষ্য রেখে তৈরী মাটির মডেল,লাইব্রেরী এসব আর সাথে বইপত্রের কাউন্টার।এই বিল্ডিং-এ বহু মানুষকে দেখলাম (ছাত্রছাত্রীও) পড়াশোনা করছে মন দিয়ে ; আমার মনে হলো ওরা এই সময়ে দাঁড়িয়েও গান্ধীজীর ভাবনাচিন্তা নিয়ে কত ভাবছে।আশ্রমের পথে চলতে চলতে সামনে এসে পড়লো উন্মুক্ত প্রার্থনাস্থল।

*প্রার্থনা স্থল*

মনে আছে তো তোমাদের গান্ধীজীর প্রার্থনা সংগীত...রঘুপতি রাঘব রাজা রাম? সামনের শুকনো সবরমতী নদী, সাদা মাটা প্রার্থনাস্থলের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হলো ওই সেই সবরমতী যার তীরে ১৯৩০ সালের মার্চ মাসের ১২ তারিখের হাল্কা শীত মাখা সকালে ভারতীয় রাজনীতির এক অহিংস সাধু গান্ধীজী ডান্ডী অভিযান শুরু করেছিলেন ৭৮ জন সাথীকে নিয়ে।ইতিহাসে নিশ্চয়ই পড়েছো তোমরা অনেকে কেন ডান্ডী অভিযান; বৃটিশ সরকার বিদেশী নুনকে ভারতে বিক্রীর সুবিধে করে দেওয়ার জন্য ভারতীয় দেশী নুনের ওপরে কর চালু করেছিলেন যাতে মানুষ বিদেশী নুন বেশী করে কেনে! কি চক্রান্ত দেখেছো তো?

প্রার্থনাস্থল থেকে হাঁটতে হাঁটতে ডানদিকে এসেই “হৃদয় কুঞ্জ” যেখানে গান্ধীজী থাকতেন; সামনে গান্ধীজীর ঘর; বিছানার পাশে চরকা রাখা।সাদা তোষক পাতা আছে সাদামাটা মেঝেতে।এই ঘর ছিলো

ভারতীয় রাজনীতির একসময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাস্থল।

*হৃদয়কুঞ্জের সামনে*

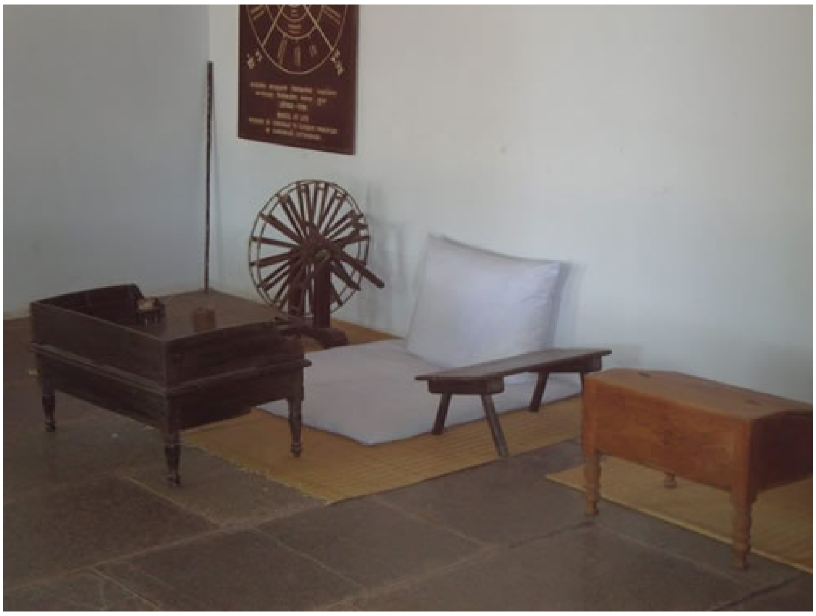

*গান্ধীজির ঘর*

পাশে প্রশস্ত বারান্দা। পেছনেই রয়েছে কস্তুরবা গান্ধীর ঘর, আর তারপাশে চৌকো উঠোন।আমি উঠোনে বসেছিলাম কিছুক্ষন।আমার মনে হচ্ছিলো আমি ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে চলে গেছি সেই দিনগুলোতে যখন বৃটিশ সরকারের অত্যাচারে সারা ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন তুঙ্গে।একপক্ষ হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে যুদ্ধ করে বৃটিশ সরকারকে পরাজিত করবে বলে।আর গান্ধীজী পথ দেখিয়েছেন অহিংস সত্যাগ্রহের।ভাষাটা খটমট হলেও মানেটা সহজ কিন্তু পালন করা কিন্তু ভীষন কঠিন।তোমাকে যখন

কেউ অত্যাচার করবে তুমি তখন তার বিরুদ্ধে হাত না তুলে তাকে শান্ত ভাবে বোঝাবে তুমি কি চাইছো।এতে একদিন না একদিন অত্যাচারী নিজের ভুল বুঝবেই।কিংবা সারা পৃথিবীর মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করবেই যাতে অত্যাচারী আর হাত না ওঠায়।তোমরা কিন্তু নিজেদের জীবনেও এটা প্রয়োগ করতে পারো।ভীষন কাজের একটা কথা জানোতো এটা।গান্ধীগিরির ভক্ত মুন্নাভাই এর কাছে তো সিনেমাতেও দেখেছো তাই না?

*হৃদয়কুঞ্জের ভেতরের উঠোন*

হৃদয় কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসে গেলাম আচার্য্য বিনোবা ভাবের কুটিরে।যে মারাঠী সুপন্ডিত মানুষটি গান্ধীজীর যোগ্য উত্তরসূরী ছিলাম অহিংস আন্দোলনের।সেই কুটিরটি আবার মীরাবেনের কুটির নামেও পরিচিত কারন একসময় এখানে বৃটিশ অ্যাডমিরালের এক অহিংস ভাবের মেয়ে মীরাবেন(গান্ধীজীর দেওয়া নাম) গান্ধীজীর পথে জীবন কাটিয়েছিলেন নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে।

*আচার্য্য বিনোবা ভাবের কুটির*

এর পরে হাঁটতে হাঁটতে দেখছিলাম হরিজন্-সেবা হসপিটাল,গো-শালা,খাদি-প্রতিষ্ঠান আরো নানা সেবামূলক ও শিক্ষামূলক সেন্টার।গান্ধীজী এক নতুন ভারতবর্ষের কথা ভেবেছিলেন যে ভারতবর্ষ হবে প্রাচীন বৈদিক সমাজ-অনুসারী অথচ চিন্তাভাবনায় আধুনিক আর মানুষের সেবায় নিয়োজিত। সেই ভাবনাকেই এই আশ্রমের জীবনযাত্রায় জুড়ে দিয়েছিলান, যাতে সেখানে হরিজনদের কেউ অস্পৃশ্য বলে ঘেন্না না করে কাছে টেনে নেয়; আরাম-আয়েস বাদ দিয়ে সাধারন চরকায় কাটা খাদি পোশাক করে অতি সাধারন কুটিরে থেকে আর অতি সাধারন খাওয়াদাওয়া করে কিন্তু উচ্চ চিন্তা-ভাবনা আর দেশের কাজের কথা ভেবে যায় আশ্রমিকেরা দিনরাত; আর ঈশ্বর বলে যিনি আছেন তাঁকে স্মরণ করেই জীবনের প্রতিটা দিন্কাটিয়ে যেতে পান এই মানুষেরা,শুধু সত্যের পথ ধরে।

আশ্রম থেকে বেরিয়ে এলাম হাঁটতে হাঁটতে।মনে হচ্ছিলো এত দিন হলো ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো আমরা কি গান্ধীজীর স্বপ্নকে এখনো সঠিক রুপ দিতে পেরেছি।হ্যাঁ, কিছু কিছু তো হয়েছেই মানুষের সেবা। আরো অনেক কাজ বাকি।ছোট্ট বন্ধুরা আমরা যদি আমাদের কাজ ভালো করে করি তাহলেই আমাদের দেশ অনেক এগিয়ে যাবে।তোমরা যদি ভালো করে পড়াশোনা করো,বাবা মায়ের সাথে তর্ক না করে শান্ত হয়ে তোমাদের কথাটা বলো, টিচারকে কখনো মিথ্যে না বলো,তোমাদের থেকে যারা কম পেয়েছে জীবনে তাদের একটু হলেও সাহায্য করো তাহলেই দেখবে তোমরা দেশের জন্য অনেক কাজ করে ফেলেছো।কারন তবেই তো তোমরা সঠিক ভাবে বড় হবে আর মানুষের মতো মানুষ হবে।আর মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে পারলে আমাদের এই দেশ তোমাদের জন্য গর্বিত হবে ... যেমন করে মৃত্যুর ৬২ বছর পরেও গান্ধীজীর ত্যাগ আর দেশভক্তির কথা মনে এলেই আমাদের মাথা শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়,সারা পৃথিবীতে ভারতবর্ষের গর্ব হয় এই ভেবে যে মহাত্মা গান্ধী এই দেশের মাটিতেই জন্মেছিলেন।

তোমরা সবাই ভালো থেকো আর সুযোগ পেলে ঘুরে এসো এই মহাতীর্থ।আজকের মতো ... টা...টা।

লেখা ও ছবিঃ
অতনু ব্যানার্জি
কলকাতা

মহাত্মা গান্ধীর ছবিঃ
উইকিপিডিয়া

## ছবির খবর

# মাল্লী

ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে চান করছে গাছগুলো, নিঝুম হয়ে ভিজছে হরিণ, কাঠবেড়ালী, রঙীন ডানার প্রজাপতি, হলুদ রঙের ছোট্ট পাখি, বড় পাতার লতানো গাছ... সবাই। ভিজছে এই বিশাল অরণ্য...আর এদের সাথে ভিজছে ছোট্ট মেয়ে মাল্লী।

ও তুমি বুঝি মাল্লীকে চেনো না? আচ্ছা একটু সবুর করো বাপু, আমি তোমাকে মাল্লীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। তার আগে বলো তো, তুমি কি কোনোদিন জঙ্গলে বেড়াতে গেছো?

পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখেছো জঙ্গলকে?

সেই সব দেড়শো-দুশো বছরের পুরোনো গাছ গুলোর কাছে গিয়েছো?

ছুঁয়ে দেখেছো তাদের?

ভাবছো এই এতো প্রশ্ন করছি কেনো আমি। তার একটা কারণ আছে। যদি সত্যি এরপর কোনোদিন জঙ্গলে যাও...যদি সত্যি তুমি পায়ে হেঁটে মা, বাবা, কিম্বা দিদির সাথে জঙ্গলে ঘোরো তাহলে কিন্তু অনেক পুরোনো গাছ গুলোর কাছে যেও। তাদের গায়ে হাত দিও। আর তোমার কেমন লাগলো ফিরে এসে জানিও আমাকে। ইচ্ছে করলে কথাও বলতে পারো তাদের সাথে। হ্যাঁ, গাছ বুঝবে তোমার কথা। সত্যি।

অন্তত মাল্লী সেই কথা বিশ্বাস করে। মাল্লী গাছের সাথে, পাখির সাথে, মাছের সাথে, বয়ে চলা হাওয়ার সাথে কথা বলে...গল্প করে...সবাইকে ভালোবাসে। এই অরণ্য তার বন্ধু।

গাছ-গাছালিতে ঘেরা দক্ষিণ ভারতের জঙ্গলের মধ্যে ছোট্ট একটা গ্রামে মাল্লী থাকে। তার খুব কাছের বন্ধু ফরেস্ট অফিসারের ছোট্ট মেয়ে, যে কানে শুনতে পায়না, কথা বলতে পারেনা। অথচ মাল্লীর সাথে টই টই করে সারাদিন জঙ্গলে ঘোরে আর গাছের সাথে, পাখির সাথে, হরিণের সাথে বন্ধুত্ব পাতায়।

মাল্লীর আরো বন্ধু আছে ডাকঘরের পিয়ন, দুজন ফরেস্ট গার্ড আর গ্রামের সেই প্রাচীন বুড়ি যে তাকে

ময়ূর ঠাকুরের গল্প বলেছিলো। যে ঠাকুর জঙ্গলে থাকেন আর কেউ যদি ভালো কাজ করে তাহলে তার ইচ্ছে পূরণ করেন। ঠাকুর তার ইচ্ছাপূরণের নীল রঙের পাথর দিয়ে যান। মাল্লীর ইচ্ছে তার শহর থেকে আসা বন্ধুটি যেন কথা বলতে পারে, শুনতে পারে।

কিন্তু কবে আসবে ময়ূর ঠাকুর? মাল্লী প্রতীক্ষা করে।

এদিকে জঙ্গলের মধ্যে বাড়ছে চোরা শিকারীদের উতপাত। তারা অবাধে মেরে ফেলছে ছোট্ট পাখি, কাঠবেড়ালী, কেটে ফেলছে অনেক পুরোনো সব গাছ যারা মাল্লীর বন্ধু। এইসব দেখে মাল্লীর খুব দুঃখ হয়, কান্না পায়, কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। শুধু সেই প্রাচীন বুড়ি বলে, এদের সবাইকে ময়ূর ঠাকুর শাস্তি দেবে। একদিন মাল্লী জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে পায় তার প্রিয় হরিণ ছানাকে, যার পায়ে গুলি করেছে শিকারী আর ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে ছানাটি।

মাল্লী হরিণ ছানাকে ভালো করতে লুকিয়ে রেখে আসে ডাক্তার কাকুর বাড়ি আর ঠিক সেই রাতে মাল্লীর স্বপ্নে আসেন ময়ূর ঠাকুর।

কি সুন্দর পেখম ছড়িয়ে দিয়ে নাচেন ঠাকুর। চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে ফুল, সুন্দর আলো। তিনি মাল্লীকে দেন নীল রঙের একটা পাথর। এই পাথর পেলে মাল্লীর বন্ধু কি সত্যি ভালো হয়ে যাবে?

এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দেন না পরিচালক সন্তোষ শিবন। তাঁর ক্যামেরা শুধু ঘুরে বেড়ায় মাল্লীর সাথে জঙ্গলের ভেতরে... লতায়...পাতায়...নদী আর ঝরনার জলে... তাদের গ্রামে। যে গ্রাম গুলোর কথা তুমি বা আমি খুব কম জানি, যাদের কথা কেউ খবরের কাগজে লেখে না, টিভিতে দেখায় না। যে গ্রামের লোকেরা খুব গরীব কিন্তু যারা প্রাণ দিয়ে আগলে রাখে জঙ্গলকে।

এমন গ্রামের কথা, মানুষের কথা, সবার কথা খুব সুন্দর করে বলেন সন্তোষ শিবন তাঁর ছবিতে। তাহানের কথা মনে আছে তো? সেই কাশ্মীরের ছেলেটা। মাল্লীও তেমনই। যদি কোনোদিন ছবিটা দেখো, যদি তোমার লিখতে ইচ্ছে হয় তাহলে ইচ্ছামতীকে জানিও। ইচ্ছামতী তোমার ছবি দেখার, তোমার লেখা পাওয়ার আশায় রইলো। আর এই বর্ষায় আমার তরফ থেকে তোমার জন্য রইলো জল ছপছপে অনেক শুভেচ্ছা। ভালো থেকো।

কল্লোল
উত্তরপাড়া

ছবিঃ
ইউটিউব

## সকুট/দ্য সাইলেন্স

সকুট / দ্য সাইলেন্স

আমি আজ একটি ইরানের চলচ্চিত্র নিয়ে লিখব। সিনেমার নাম “সকুট” যার মানে নিরবতা। সিনেমার পরিচালকের নাম মোহসিন মাখমালবাফ। এটি একটি ১০ বছরের ছেলের গল্প। ছেলেটি তাজাকিস্তানে তার মার সাথে থাকে।যদিও সে চোখে দেখতে পায় না কিন্তু কানে শুনতে পারে। এর নাম খুরশীদ। খুরশীদের এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সে গান খুব ভাল বাসতো আর সুর শুনে বাদ্য যন্ত্র ঠিক করতে পারতো। সে খুবই গরীব ছিল।বাড়ি ভাড়ার টাকা যোগার করার যন্য তাকে এক বাদ্য যন্ত্রের দোকানে কাজ করতে যেতে হয়। বাড়ির ভাড়া বাকি থাকায় তাকে চাকড়ি নিতে হয়।

রোজই কাজে পৌঁছাতে তার দেরী হয়ে যায় কারণ সে আসে পাসের ফকির বা যাযাবরদের গান শুনতে শুনতে তাদের সঙ্গে পথ চলতে শুরু করে আর সময়মতো দোকানে পৌঁছাতে পারে না। দোকানে

খুরশীদের নাদিরা বলে একটি ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে দেখা হয় যে খুরশীদের খুব ভাল বন্ধু হয়ে ওঠে।

খুরশীদ রাস্তা হারিয়ে ফেল্লে সেই রোজ খুঁজে নিয়ে আসে। শেষে তার চাকরি চলে যায়। কিন্তু সে নিজের মনে বিথোভেন এর ৫-ম সিম্ফনি শুনতে পায়। তার গানই তার মনকে রাঙ্গিয়ে রাখে।

সিনেমায় দুই ছোট্টচ্ছেলে-মেয়ের অভিনয় দক্ষতা প্রশংষার যোগ্য। ক্যমেরার কাজ ও সুন্দর। গানের ব্যবহারও মানানসই। আমার প্রথম দেখায় ভাল লাগার মধ্যে একটি সিনেমা।
সিনেমাটি ইরানি ভাষায় তাই উপশিরোনামা থাকা দরকার।

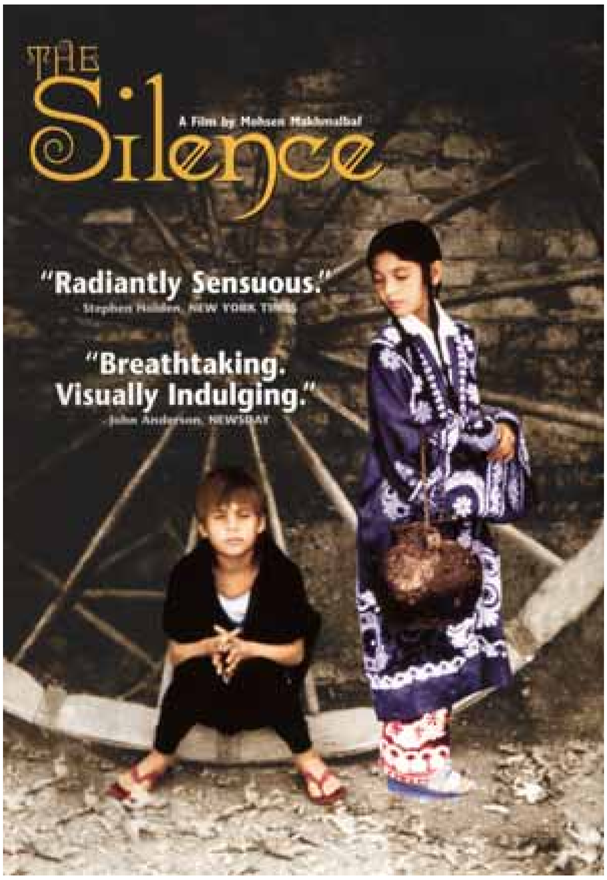
THE
Silence
A Film by Mohsen Makhmalbaf
"Radiantly Sensuous."
- Stephen Holden, NEW YORK TIMES
"Breathtaking. Visually Indulging."
- John Anderson, NEWSDAY

রঞ্জনা গুহ
মেক্সিকো সিটি
মেক্সিকো

ছবিঃ
ফিরোজানফিল্মস্

# বায়োস্কোপের বারোকথা: ভারতে এল সিনেমা

বায়োস্কোপের বারোকথা
ভারতে এল সিনেমা

পর্ব আট

সাগরপারের কথা তো অনেক হল। এবার বরং আমাদের দেশের কথা একটু ভেবে দেখা যাক। কি ভাবছিলাম আমরা সিনেমা নিয়ে? মজার কথা এই যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত' উপন্যাসে কিশোর অপু যখন জানতে চাইছিল, কলকাতা শহরে বায়োস্কোপ যেখানে দেখানো হয়, সেই জায়গাটা কোথায়, প্রায় সেই সময়েই কলকাতার এক বালক, যার নাম সত্যজিত রায়, প্রথম বাংলা বায়োস্কোপ দেখে। সে ছবি তার মন ভরায়নি। কিন্তু সেই গল্প পরে। আগে জেনে নিই, ভারতে প্রথম সিনেমা কবে কোথায় দেখানো হল।

একদিন জুলাই মাসে, বর্ষার এক ভেজা বিকেলে, বম্বের (এখনকার মুম্বই) সাহেব ও মেমসাহেবরা প্রথম লুমিয়ের ভাইদের তৈরি কয়েকটা ছবি দেখেন। সেই সন্ধ্যায় টিকিটের দাম ছিল অনেক - এক টাকা!!

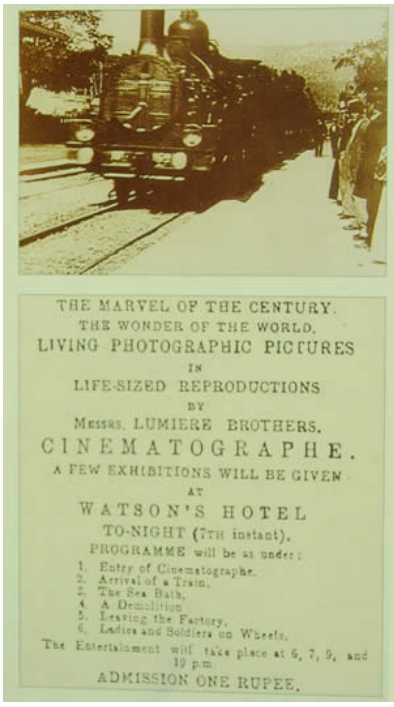

THE MARVEL OF THE CENTURY.
THE WONDER OF THE WORLD.
LIVING PHOTOGRAPHIC PICTURES
IN
LIFE-SIZED REPRODUCTIONS
BY
Messrs. LUMIERE BROTHERS.
CINEMATOGRAPHE.
A FEW EXHIBITIONS WILL BE GIVEN
AT
WATSON'S HOTEL
TO-NIGHT (7TH instant).
PROGRAMME will be as under:

1. Entry of Cinematographe.
2. Arrival of a Train.
3. The Sea Bath.
4. A Demolition
5. Leaving the Factory.
6. Ladies and Soldiers on Wheels.

The Entertainment will take place at 6, 7, 9, and 10 p.m.
ADMISSION ONE RUPEE.

*প্রথম ছবি প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন*

*ওয়াটসন হোটেল, বম্বে(মুম্বই) তে যেখানে প্রথম ছবি দেখানো হয়েছিল*

দর্শকেরা বেশ মজা পেয়েছিল। এই প্রদর্শনীর সফলতায় উতসাহ পেয়ে ধীরে ধীরে বম্বের নানা জায়গায় ছবি দেখানো শুরু হয়। শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য থাকতো বিশেষ 'জেনানা শো' আর শ্রমজীবী মানুষদের জন্য সস্তায় বিশেষ প্রদর্শনী ব্যবস্থা- যেটাকে বলা হত 'চার-আনা-ওয়ালা শো'।

কলকাতায় সম্ভবতঃ প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হয় চৌরঙ্গীর রয়্যাল থিয়েটারে- ১৮৯৭ সালের ২০শে জানুয়ারি। স্টেটসম্যান পত্রিকার বিজ্ঞাপন থেকে এই তথ্য জানা গেছে। তবে ছায়াছবি আরো বেশি মর্যাদা পেতে শুরু করল যখন সেই সময়ের বিখ্যাত থিয়েটার, স্টার থিয়েটার, তাদের নাট্য প্রদর্শনীর ফাঁকে ফাঁকে এক রিলের ছবি দেখানো শুরু করল। স্টার এর প্রদর্শন যন্ত্রটির নাম ছিল 'বায়োস্কোপ'। সেই থেকেই বাঙালিদের মধ্যে 'সিনেমা'র বদলি শব্দ হয়ে গেছে 'বায়োস্কোপ'।

এভাবে যখন টুকরো টুকরো ছবি দেখানো হচ্ছে, তখন আবার ফাদার লাফো, কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স্ কলেজে বিজ্ঞানের ক্লাস নিতে নিতে দেখাচ্ছেন ছোট ছোট শিক্ষামূলক ছবি। এভাবেই বাংলা ছবি একদিন খুঁজে পেল ভারতীয় ছায়াছবির সত্যিকারের পথিকৃত হীরালাল সেন কে।

তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, কলকাতায় ম্যাডান রা আর বম্বেতে আব্দুলআলি-ইউসুফআলি তাঁবু খাটিয়ে সার্কাসের মত করে ছবি দেখাচ্ছেন। কেমন ছিল এইসব ছবি? -ইউরোপ-আমেরিকার নানা দৃশ্য, যেমন রানীর অন্তিম যাত্রা, বা রাষ্ট্রপতি ম্যাকিনলের হত্যা- এইরকম সব ঘটনা। আমাদের দেশীয় লোকজনের কাছে এসব প্রায় ম্যাজিক মনে হত। তাদের ততটা ভালোও লাগত না।

এইরকম একই অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে নামী ঔপন্যাসিক গ্যাব্রিয়েল

গার্সিয়া মার্কেজ, তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ওয়ান হাণ্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিটিউড' এ লাতিন আমেরিকায় প্রায় এক ই রকমের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিচ্ছেন- একটা ছোট্ট হলদে ট্রেনে করে ছবি এল; মাকোন্দো নামের ছোট্ট শহরে লোকেরা প্রদর্শনীগুলিতে সিনেমাকে নেহাতই জাদু-ভেলকি ভেবে বিরক্তই হচ্ছিল; অবশেষে শহরের মেয়র তাদেরকে শান্ত করার জন্য বললেন- সিনেমা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয় যে তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে।

ভারতবর্ষের মানুষেরও একই অভিজ্ঞতা হল। তারপর এখানেও ধীরে ধীরে আমাদের নিজস্ব নিসর্গ চিত্র বা সামাজিক উতসবের ছবি তোলা শুরু হল। পশ্চিম ভারতে এরকম মানুষ ছিলেন হরিশ্চন্দ্র সখারাম ভাটওয়াডেকর। আর পূর্ব ভারতে হীরালাল সেন।

*ভারতীয় জীবনযাত্রা দেখিয়ে প্রথম দিকের মজাদার ছবি*

কলকাতায় যখন মনুমেন্ট ময়দানের একটু দক্ষিণে তাঁবু ফেলে ফরাসি পাতে কোম্পানি ছবি দেখাতে এল, প্রায় তখন থেকেই মূলতঃ পূর্ববঙ্গীয় এই যুবক নানা ধনীগৃহে ও বাগান বাড়িতে এইসব ছবি দেখাতেন। 'দ্য বেঙ্গলি' নামে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন আমাদের জানাচ্ছে যে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটারে, নাটক প্রদর্শনীর বিরতিতে কিছু চমকপ্রদ চিত্র প্রদর্শিত হবে, যেমন- ভ্রমর, আলিবাবা, দোল লীলা ইত্যাদি; বিজ্ঞাপনের তারিখ ১৯০১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি।

*আলিবাবা*

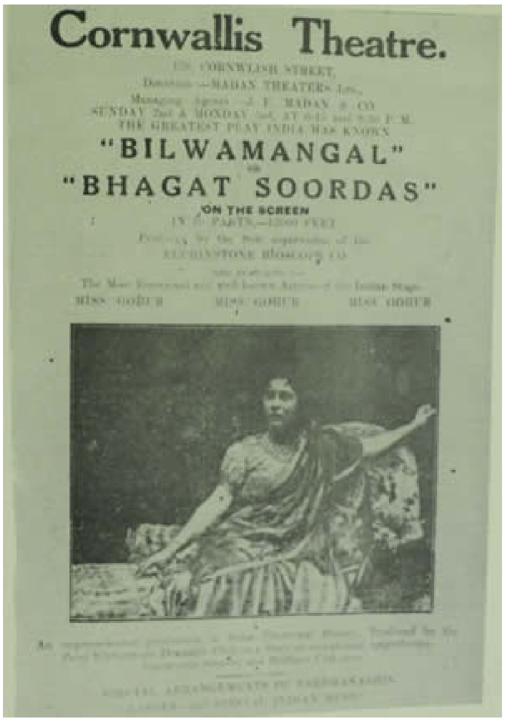

Cornwallis Theatre.

CORNWALLIS STREET,

Directors—MADAN THEATERS Ltd.,

Managing Agents—J. F. MADAN & CO

SUNDAY 2nd & MONDAY 3rd, AT [illegible] P.M.

THE GREATEST PLAY INDIA HAS KNOWN

"BILWAMANGAL"

or

"BHAGAT SOORDAS"

ON THE SCREEN

IN [illegible] PARTS—[illegible] FEET

ELPHINSTONE BIOSCOPE CO

The Most [illegible] Actress of the Indian Stage

MISS GOHUR MISS GOHUR MISS GOHUR

*বিল্বমঙ্গল ছবির বিজ্ঞাপন*

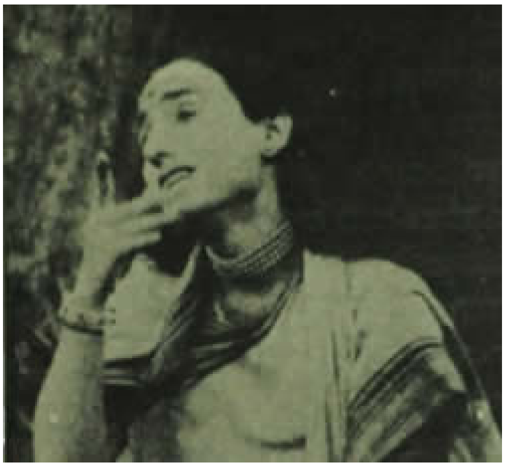

*সালুঙ্কে - প্রথম পুরুষ অভিনেতা যিনি নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন*

হীরালাল ও হরিশচন্দ্র দুজনেই দিল্লি- দরবার, রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক এই জাতীয় কিছু তথ্যচিত্র বানিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, ১৯১৭ সালে এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে হীরালাল সেনের সমস্ত ছবি ছাই হয়ে যায়। তার মাত্র দুদিন বাদেই স্বয়ং হীরালাল সেন নিজেও চিরবিদায় নেন। হারিয়ে গেল বাংলা সিনেমার আদিপর্বের ইতিহাস।

যে মানুষটি বাংলা সিনেমা তৈরি করা ও দেখানোর পুরো ব্যবস্থাটাই সাজিয়ে তোলেন, তিনি নিজে কিন্তু মোটেই বাঙালি নন-পার্শী ছিলেন। তার নাম ছিল জামশেদজি ফ্রানজি ম্যাডান। মধ্য কলকাতার চাঁদনি অঞ্চলে তাঁর নামে একটা রাস্তা আছে। তাঁর এলফিনস্টোন বায়োস্কোপ কোম্পানি হীরালালের

মৃত্যুর বছরই প্রথম বাংলা কাহিনীচিত্র বানায়- সে ছবির নাম 'সত্যবাদী রাজা হরিশচন্দ্র'।

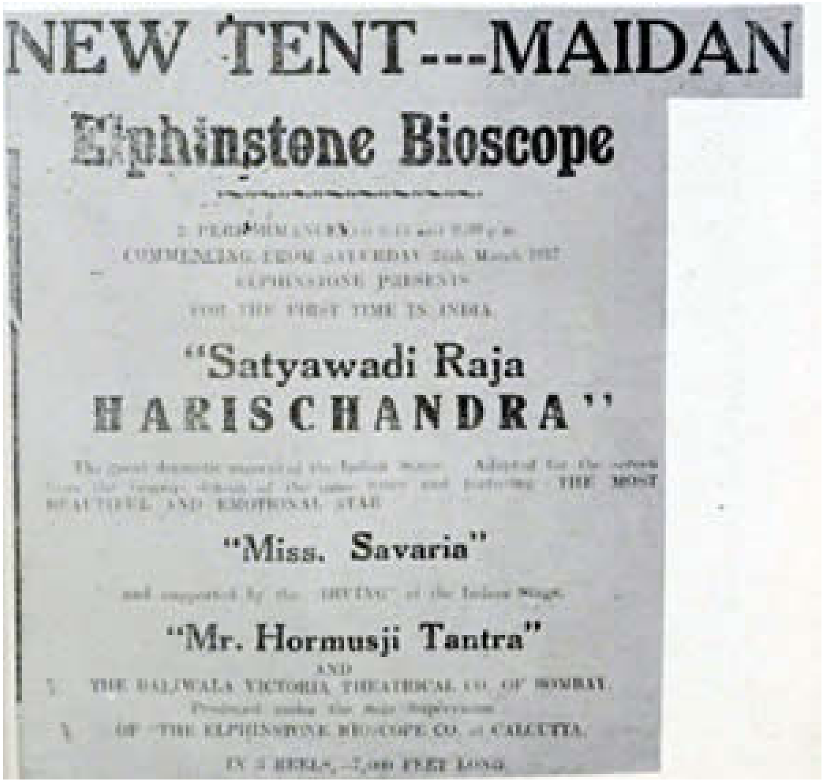

NEW TENT---MAIDAN

Elphinstone Bioscope

2 PERFORMANCES [illegible]

COMMENCING FROM SATURDAY [illegible] March 1917

ELPHINSTONE PRESENTS

FOR THE FIRST TIME IN INDIA

"Satyawadi Raja
HARISCHANDRA"

[illegible] THE MOST BEAUTIFUL AND EMOTIONAL STAR

"Miss. Savaria"

and supported by the [illegible] of the Indian Stage

"Mr. Hormusji Tantra"

AND

THE DALIWALA VICTORIA THEATRICAL CO. OF BOMBAY.

Produced under the [illegible] Supervision

OF THE ELPHINSTONE BIOSCOPE CO. of CALCUTTA.

IN 5 REELS,—7,000 FEET LONG.

*রাজা হরিশ্চন্দ্র ছবির বিজ্ঞাপন*

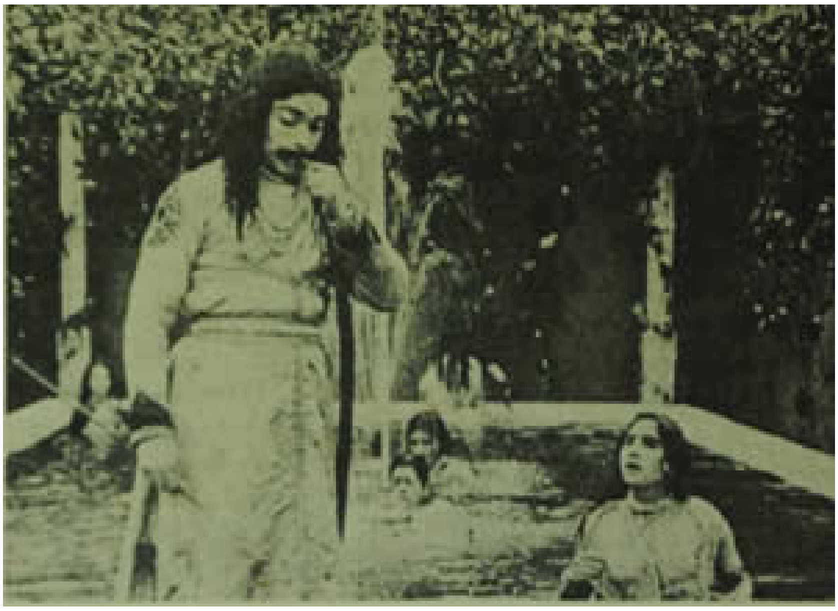

*এই ছবিতে মেয়েদের ভূমিকায় পুরুষরা অভিনয় করেছিলেন*

শুধু বানায় না, দেখানোরও ব্যবস্থা করে। অবশ্য বোম্বে শহরে ইতিমধ্যেই এক মারাঠী ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষের প্রথম কাহিনীচিত্র 'রাজা হরিশচন্দ্র' বানিয়ে ফেলেছেন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলেন

১৯১৩ সালে। আর ভারতীয় সিনেমার প্রথম দর্শকরা সেই একই বছরে বড় পর্দার সামনে বসে চোখ বড় বড় করে দেখল কিভাবে রাজা হরিশচন্দ্র ধর্মের জন্য সব ত্যাগ করলেন। এইসব নিয়ে আরো নানা গল্প হবে আগামি সংখ্যায়।

(ক্রমশঃ )

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, চলচ্চিত্র বিদ্যা বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ছবি নেওয়া হয়েছে এই বইগুলি থেকেঃ
বেঙ্গলি ফিল্ম ডিরেক্টরি, নন্দন
সো মেনি সিনেমাস -বি ডি গর্গ
ফিল্ম ইন্ডিয়া লুকিং ব্যাক ১৮৯৬-১৯৬০, দ্য ডিরেক্টরেট অফ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালস্, নিউ দিল্লি

# পরশমণি: কেন 'বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল'

কেন 'বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল'

সেই ছোট্টবেলার পড়ার বইয়ের ছড়াটা মনে আছে? সেই যে -

'ওল খেও না ধরবে গলা, ঔষধ খেতে মিছে বলা'?

কথাটার অর্থ কি বল ত? একটা ত' ও আর ঔ শেখা। আর একটা হল ওষুধ খাও আর না-ই খাও, ওল খেয়ে গলা ধরলে ভারি মুশকিল। দুর্ভোগ যা পোয়াবার সেটা পোয়াতেই হবে! কোন কিছুতেই - কোন ওষুধেই ধরা গলা সারবে না।

কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। একবার ছোট বেলায় শাকালু ভেবে ভুল করে কচু খেয়ে যে কষ্টে পড়েছিলাম তা আর কি বলব। শেষে তেঁতুলের আচার খেয়ে রেহাই পাই-- গলার জ্বালা, ব্যথা কমতে তিন চার দিন সময় লেগেছিল!

তা, তোমার বাবা এমনিতে ত খুবই ভাল, তাই'ত? তবে মাঝে মাঝে ঝামেলার একেকটা কাজ যে করেন, এটাও ত সত্যি, নাকি? আজ কি করেছেন সেটা রান্না ঘরে এখন একবার গেলেই টের পাবে। রান্নাঘরে গিয়ে বাজারের ব্যাগটাতে উঁকি দিয়ে দেখ। এক টুকরো মানকচু রয়েছে। তার মানে সেই গলা চুলকানি আর ব্যাথা।

কচু

কচু দেখে মাথাটা বিগড়ে গেল ত? বাবাকে নিয়ে হয়েছে এই এক জ্বালা, বাজারে কচু জাতিয় কিছু দেখতে পেলেই হল, কেনা চাইই চাই! কি না, 'খেয়ে দেখ, খুব ভাল খেতে!' যত্তো সব!

কিন্তু কি আর করবে! কোনও উপায়ে গিলতে হবে আর গলা ধরবে, আর সেটা সারাতে টকও খেতে হবে। ঝাল, মিষ্টি, নোনতা না খেয়ে শুধু টকই খেতে হবে কেন বল দেখি? এত না ভেবে তার চেয়ে চল, 'যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল' প্রবাদটা কেন এসেছে সেটা দেখি বরং। সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তাতে।

ওল ছাড়াও অন্য কচু জাতীয় সবজি, যেমন মান বা অন্যান্য কচু--এসব খেলেও গলা ধরে। বাড়িতে এসব সবজি এলে বা রান্না হলে বেশির ভাগ মানুষই বিরক্ত হন। স্বাভাবিক। কে আর সাধ করে খেতে গিয়ে কষ্ট পেতে চায় বল!

কিন্তু মানুষের স্বভাবটা ত জান, সে প্রায় সব কিছুই খায়। কোনওটা খেতে খারাপ হলে খাওয়ার উপযোগী করে নেয় নিজের মত করে। এটা ওটা করে একদিন মানুষ আবিষ্কার করে ফেলল যে টক খেলে গলা ধরা সেরে যায়। আর হরেক রকম টকের মধ্যে তেঁতুলই বেশী টক। তাই সাংঘাতিক ধরনের বুনো ওল খেয়ে গলা ধরলে তেঁতুল ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাই ওই প্রবাদটা এসেছে।

*তেঁতুল*

তবে শুধু যে তেঁতুলই খেতে হবে এমন কোন কথা নেই, অন্য টকেও কাজ হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রান্না করার সময়ই প্রয়োজন মত টক দিয়ে দেওয়া হয় যাতে গলা ধরার ব্যাপারটা না ঘটে।

কি, জানতে ইচ্ছা হচ্ছে ত' যে ওল খেলে গলা কেন ধরে আর টক খেলে সারেই বা কেন! সেটা বলি এবার।

কিন্তু সে সব জানতে হলে আর অন্য দু'একটা কথা জানতে হয় যে আগে! তেমন কথা গুলো সেরে নি।

'কৃষ্ট্যাল' বা কেলাস কাকে বলে সেটা দেখি আগে, দরকার লাগবে। আমাদের চারপাশে যে সব কঠিন পদার্থ দেখি তাদের কোনও কোনটা দানাদার, যেমন চিনি মিছরি বা ফিটকিরি কিংবা তুঁতে। এদের

দানাগুলো নানা আকারের দেখতে হয়, কেউ চৌকো, কেউ বা পিরামিডের মত, বা কারও আকার আবার লম্বাটে সুচের মতও হয়। এছাড়া আরও অনেক রকম দানাদার বস্তু আছে। এদের মধ্যে যাদের সহজেই আমাদের আশপাশে দেখা যায় তেমন কয়েকটির নাম করলাম।

চিনির কেলাস

এখানে তোমাদের একটা কেলাসের কথা জানিয়ে রাখি, যদিও এ লেখাটার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। জল তরল পদার্থ, কিন্তু সেটা জমে যখন বরফ হয়ে যায় তখন এরও কেলাস তৈরী হয় অন্য কঠিন পদার্থের মত। সে কেলাস অনুবীক্ষনের নীচে দেখা যায়। ভারি চমতকার দেখতে সেগুলো- নানা নক্সার বৃত্তাকার ফুলের মত!

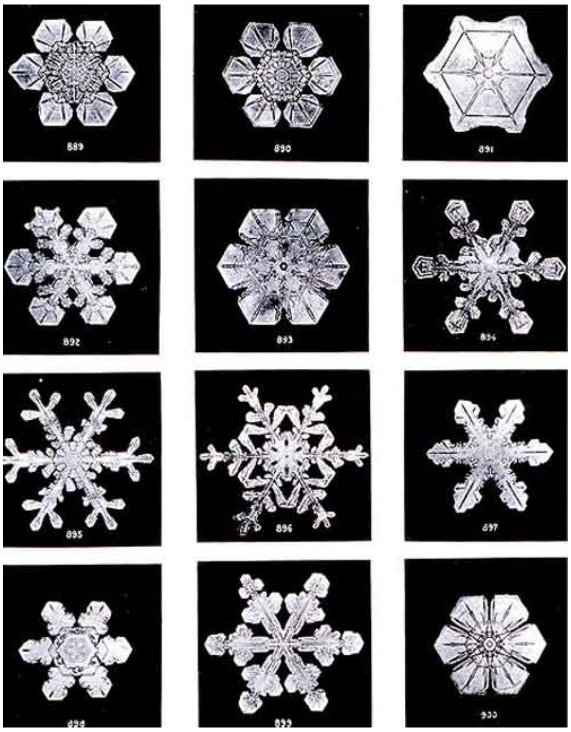
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900

তুষার কেলাস

এবার আমরা আমাদের কথায় আসি।

কোন কোনও কঠিন পদার্থ আবার একেবারে মিহি পাউডারের মত, আটা বা ময়দা, গায়ে মাখা ট্যালকম পাউডার। এমন অনেক জিনিষ আছে। এরা কেউই কেলাসের দলে পড়ে না। ওপরে লেখা ঐ দানাদার বস্তু গুলোই হল কৃষ্ট্যাল বা কেলাস। বড় হয়ে যখন রসায়ন বা কেমিস্ট্রি বই পড়বে তখন এ বিষয়ে আরও অনেক কিছু জানতে পারবে।

যে দোকানে সাজা পান বিক্রি হয় সেখানে গিয়ে দেখো একদিন কি কি জিনিষ দিয়ে পান সাজা হয়। এর মধ্যে প্রধান হল খয়ের আর চুন। শুধু খয়ের তেতো, খুব বিচ্ছিরি খেতে আর শুধু চুন যদি খাওয়া হয় জিভ গাল সব কেটে যায়, খুব যন্ত্রনাদায়ক ব্যাপার হয় সেটা। তা সত্ত্বেও পানের প্রধান উপকরন এ দুটিই।

পরিমানমত এ দুটি মিশিয়ে দিলে পান সুস্বাদু হয়। কোনটা কম বা বেশী হয়ে গেলে হয় তেতো লাগবে আর না হয় গাল কাটবে। ঠিকঠাক এরকম মেশানোর ব্যাপারটাকে বলে 'প্রশমন'। অর্থাৎ খয়ের চুনকে প্রশমিত করল বা চুন খয়েরকে প্রশমিত করল। এতে এমন একটা জিনিষ তৈরী হল যেটা খয়েরও না আবার চুনও না।

রসায়নশাস্ত্রে প্রশমন ব্যাপারটা একটা সাধারন ঘটনা। হামেশা ঘটে। আমাদের চার পাশে যেসব পদার্থ দেখি সেগুলো সব তিন শ্রেনীতে ভাগ করা যায়, যেমন অম্ল, লবন আর ক্ষার। যারা টক তারা হল অম্ল, যেমন হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিড, লেবু, তেঁতুল এই সব। আরও অনেক নাম করা যায়।

আমরা যে নুন খাই সেটা একটা লবন। এর নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড। তবে এটা ছাড়াও আরও রাশি রাশি লবন আছে। নাম শুনবে আর কয়েকটার? যেমন, ক্যালশিয়াম সালফেট, মাগনেশিয়াম ক্লোরাইড,পটাশিয়াম ক্লোরাইড-- এমন অজস্র সব নাম। আর কাপড়কাচা সোডা, সাবান, পান খাওয়ার চুন-- এরা হল ক্ষার জাতিয় পদার্থ।

পানের ক্ষেত্রে চুন আর খয়েরের যা সম্পর্ক, অম্ল আর ক্ষারের সম্পর্কও প্রায় সেই রকম। দুটোকে পরিমানমত মিশিয়ে দিলেই ওদের মধ্যে বিক্রিয়া হবে আর একে অপরকে প্রশমিত করবে। তার ফলে তৈরী হবে দু'একটা নতুন জিনিষ যাতে অম্ল বা ক্ষার কারও গুনাগুন বজায় থাকবে না। অম্লের টক ভাব থাকবে না আর ক্ষারের কষা বা কটু ভাবও থাকবে না। রসায়ন শাস্ত্রে এ ব্যাপারটাকে বলা হয়'প্রশমন'। নতুন তৈরী হওয়া পদার্থগুলোর সংখ্যা একাধিক হতে পারে। এদের একটির নাম হল লবন।

কেলাস, প্রশমন, অম্ল, ক্ষার - এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বললাম কেন তা এখনই বুঝতে পারবে। তৃনভোজি প্রানিরা গাছপালা খেয়ে বেঁচে থাকে। আবার গাছপালারও ত বেঁচে থাকার ইচ্ছে আছে, বল! তারা কি ভাবে আত্মরক্ষা করবে সেটাওত ভাবার! তবে আমাদের ওপর ছেড়ে না দিয়ে সেটা প্রকৃতি দেবী নিজেই ঠিক করে রেখেছেন। প্রত্যেকের জন্যই নানা রকমের ব্যবস্থা করা আছে তাঁর। কচু,ওল, মান - এসব গাছেরও তেমনি আছে, আর সেটার সাথেই যুক্ত এই গলা ধরার ব্যাপারটা।

*কচু গাছ*

এই সব গাছের গোড়া, কান্ড, পাতা - সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এক ধরনের সুচের মত সরু সরু কিন্তু শক্ত শক্ত কেলাস। অনেক সময় কেলাসগুলো আবার গোছা করে বাঁধা রয়েছে বলে মনে হয়, যদিও বাঁধাছাঁদার কোনও ব্যাপার নেই।খালি চোখে এদের দেখতে পাবে না, অনুবীক্ষন যন্ত্রে দেখতে হয়। খুব ছোট কিনা। এদের নাম হল 'রাফাইড' (raphide)। বাংলায় কি বলে তা বলতে পারব না।

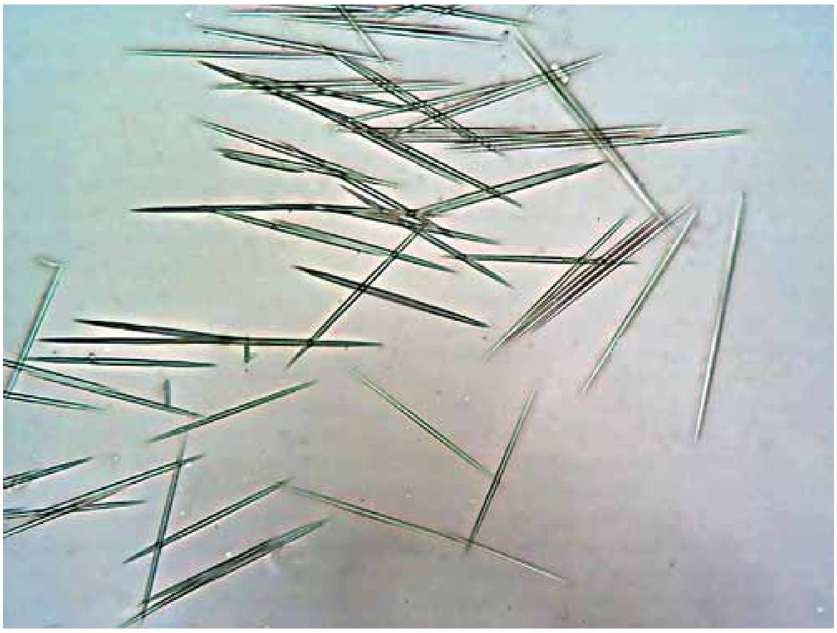

*রাফাইড*

আমরা বা অন্য কোন প্রানী এই সব গাছকে আক্রমন করলে তাদের ওই সব সরু কেলাস আমাদের গায়ে- হাতে অথবা খেয়ে ফেললে মুখে গলায় -- সর্বত্র বিঁধে যায় আর সেখানে আটকে থাকে।

তোমার হাতে সরু সুঁচ যদি বিঁধিয়ে রাখা হয় তাহলে যন্ত্রনা হয় কিনা বল। আর মুখের মধ্যে যদি সেটা হয় তাহলে ত চিত্তির একেবারে!

কিন্তু মুশকিল কি জান? আমাদের মুখের লালা কিন্তু এদের গলাতে বা সরাতে পারে না। কেন পারে না সেটাও একটা অবাক ব্যাপার! এটা নিয়ে একটু পরে বলছি।

সুঁচগুলো কি দিয়ে তৈরী সেটা বলি। এরা তৈরী ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা ক্যালসিয়াম অক্স্যালেট নামের এক ধরনের ক্ষারধর্মী পদার্থ দিয়ে। এরাই সুচের মত সরু সরু কেলাস।

ক্ষারধর্মী পদার্থকে প্রশমন করতে পারে এমন একটা পদার্থ না পেলে ওই কেলাসগুলোকে সরাবে কে? অম্ল বা টক ছাড়া আর কে পারবে? তেঁতুল হল তেমনই একটা খাদ্য যার মধ্যে কিনা রয়েছে অম্ল। এটা খাওয়া মাত্র মুখের ভেতর থাকা ক্ষার জাতিয় কেলাসগুলোর সাথে বিক্রিয়া করে সেগুলোকে প্রশমিত করে ফেলে। অর্থাৎ কেলাসরা আর কেলাস থাকে না, যেন গলে গিয়ে, অন্য বস্তুতে পরিনত হয়, তারপর খাবারের সাথে পেটের মধ্যে চলে যায়।

একটু পরে গলাধরা সেরে যায়। সুতরাং ওল খেলে যতই গলা ধরুক তেঁতুল বা লেবুর মত কোন টক খেলেই হল। তাই যত জংলী ওলই হোক, বাঘা তেঁতুল থাকলে নিশ্চিন্ত! তাহলে ওল খেতে আর আপত্তি কি?

আমাদের মুখের লালার কথা বলব বলেছিলাম, মনে আছে ত?আমাদের লালা হল ক্ষারধর্মী। তাই লালা অন্য আর এক ক্ষারধর্মী কেলাসের সাথে বিক্রিয়া করতে পারে না, সে কারনে লালা নিজে গলা ধরা সারাতে পারে না। আর একটা কথা। আচার দেখে মুখে জল আসে না এমন মানুষ আছে? হলফ করে বলা যায় যে নেই। তার মানে কি সবাই ভীষন হ্যাংলা? না তা নয়। এই ব্যাপারটা আসলে আমাদের নিয়িন্ত্রনের বাইরে। তুমি চাও আর না-ই চাও, গল গল করে লালা বেরবেই। আর আচার মুখে দিলে যে কি হয় সেটা'ত তোমাদের জানাই আছে।

যে কোন আচারই হল অম্ল। অম্ল মুখের ভেতর এলেই ক্ষারধর্মী লালা তার সাথে বিক্রিয়া করতে পারবে, এটা বুঝতে পেরে মুখে থাকা লালাগ্রন্থি গুলো ভারি সক্রিয় হয়ে পড়ে। এতে যে পরিমান লালা ঝরে, সুড়ুত করে টেনে নিতে না পারলে ভারি মুশকিল!

সন্তোষ কুমার রায়
রূপনারায়ণপুর, বর্ধমান

ছবিঃ
উইকিপিডিয়া

# কমিক্‌স্‌ কাহিনী: দস্যি ডেনিস

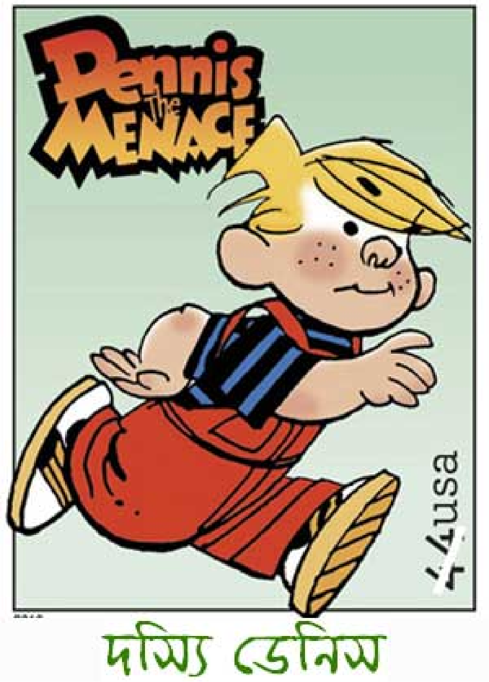

ডেনিস দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসে আছে। তার মা তাকে এই শাস্তি দিয়েছেন। সে মনে মনে ভাবছে- তার মা কিনা তার স্কুলের টিচারদেরই বিশ্বাস করেন, কিন্তু তার নিজের ছেলেকে বিশ্বাস করেননা...তাকে যে এভাবে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে...জোয়ি তো কতবার ডেকে ডেকে ফিরে গেল...কখন সে খেলতে যাবে... শাস্তির মেয়াদ ফুরোলে ডেনিস তার আদরের কুকুর রাফ কে নিয়ে চলল জোয়ি কে খুঁজতে। জোয়ি হল ডেনিসের ছায়াসঙ্গী। আর ডেনিস তাকে নানারকম বাহাদুরি দেখিয়ে থাকে। যাইহোক, খেলার শুরুতেই ডেনিস বলটাকে নিয়ে জো-ও-ও-রে ছুঁড়ে দিল...

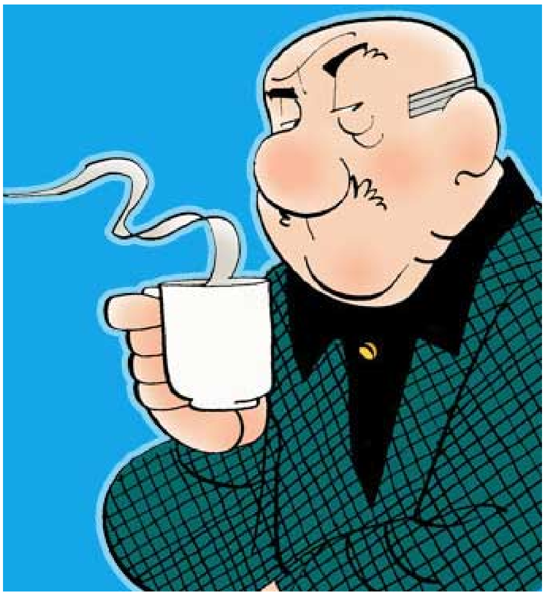

মিস্টার উইলসন ডেনিসের পাশের বাড়িতেই থাকেন। তিনি চা খেতে খেতে সুন্দর বিকেল উপভোগ করছিলেন;হঠাত একটা বল এসে তাঁর চায়ের কাপটা ভেঙ্গে চুরমার করে দিল! তিনি বলে উঠলেন- আমার সেই রাতের কথা খুব ভাল করে মনে আছে, ডেনিস যেদিন জন্মালো, সেই রাতে আকাশ থেকে তারা খসে পড়েছিল, চাঁদের চারপাশে ছিল এক গোলাকার চক্র। আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমাদের ভবিষ্যত দুর্বিপাকে পড়তে চলেছে!!"

এদিকে ডেনিসও বুঝতে পেরেছে তার আর এই চত্বরে থাকা উচিত নয়। সে হাঁটা লাগাল উলটোপথে। সে দেখতে পেল তার বাবা অফিস থেকে ফিরছেন। জোয়ি কে সে বলল -"আজ আমি তোকে একটা খুব সহজ জিনিষ শেখাব" - এই বলে সে তার পা টা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল।অমনি তার বাবা হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। ডেনিস জোয়িকে বোঝাল যে কাউকে মাটিতে ধড়াম্ করে ফেলাটা কত সোজা। জোয়ি ও একটা নতুন জ্ঞান পেয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি গেল।

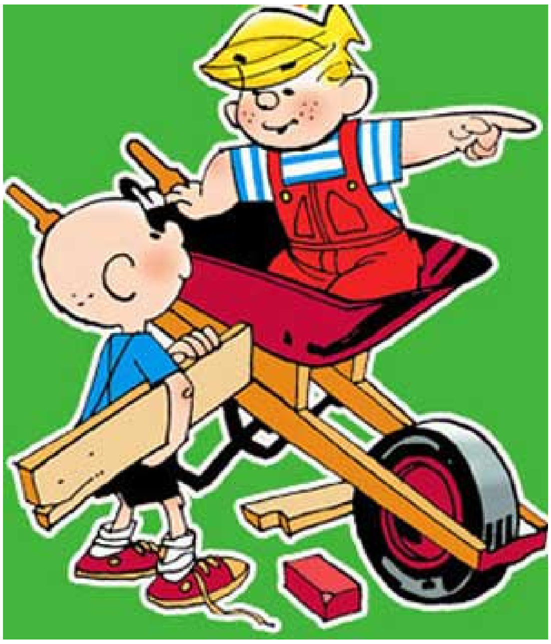

এই ভাবে দিনের পর দিন চলতে থাকে ডেনিসের নানান কান্ড কারখানা। সে তো রোজ সকালে সবার বাড়ি আসে খবরের কাগজের সাথে। তার জন্য আজ প্রায় ৪৮ টি দেশের ১০০০ টি খবরের কাগজের কমিক্স পাতাতে জায়গা পাকা।

কার্টুনিস্ট হ্যাঙ্ক কেচাম এর হাত ধরে দুর্দান্ত ডেনিসের চলা শুরু। হ্যাঙ্ক এর আসল নাম হেনরি। ছোট বেলা থেকেই তার আঁকা আঁকির দিকে প্রবল ঝোঁক। মজার মজার ছবি আঁকত হ্যাঙ্ক। ওয়ল্ট ডিসনির 'থ্রি লিটল পিগস্' দেখার পরেই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যে সে কার্টুনিস্টই হবে। ১৯৩৮ সাল নাগাদ হ্যাঙ্ক পাড়ি দিল লস অ্যাঞ্জেলেস এ। সে ওয়াল্টার ল্যানজ্ স্টুডিওতে কাজ শিখতে আরম্ভ করল। তৈরি হয়ে নিয়ে সে চলল ডিসনি স্টুডিওর উদ্দেশ্যে। প্রায় ১২ টি ডোনাল্ড ডাক এপিসোডে সে সহকারীর ভূমিকায় কাজ করল।

১৯৪২ তে হ্যাঙ্ক এর জীবনে এল এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। তিনি ফোটোগ্রাফিক স্পেশালিস্ট হিসাবে ইউ এস নেভি রিসার্ভে কাজ আরম্ভ করলেন। যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যেও তিনি তাঁর কার্টুনিস্ট সত্ত্বাকে বাঁচিয়ে

রাখলেন। চার বছর পরে তিনি ভাবলেন, আর না, এবার তিনি শুধুই কার্টুন করার দিকেই মন দেবেন। তিনি তাঁর স্ত্রী ও ছোট্ট ছেলে ডেনিস কে নিয়ে নিউ ইয়র্কের কাছাকাছি এলাকায় চলে এলেন। কাজ কর্ম ভালোই চলতে লাগল।

তখন ১৯৫০ সাল। হ্যাঙ্কের বাড়িটা প্রায় কাঁপছে। তার ছেলে ডেনিস সারা ঘর লন্ডভন্ড করে ফেলেছে। ডেনিসের মা চেঁচিয়ে উঠলেন- হ্যাঙ্ক, ইয়োর সন্ ইস আ মিনেস্!!

আর আমরাও বুঝতে পারলাম 'ডেনিস দ্য মিনেস' এর সৃষ্টির রহস্যটা...কি, তুমিও বুঝতে পারলে তো? ১৯৫১ সাল এর ১২ই মার্চ এসে গেল কমিক স্ট্রীপ জগতের সবচেয়ে দুর্দান্ত ছোট্ট ছেলেটা- যার নাম ডেনিস!

পূর্বাশা
কলকাতা

ছবিঃ
ডেনিস দ্য মিনেস

# এক্কা-দোক্কা: বিশ্বকাপ ২০১০

বিশ্বকাপ ২০১০

শেষ এক মাস তো খুব হৈ হৈ করে কেটে গেল ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে। নিশ্চয়ই দেখেছ যে তোমার থেকে আরেকটু বড় দাদা, দিদি আর বাড়ির বড়দের এই এক মাসে অনেক সময়েই আলোচনা জুড়ে ছিল ফুটবল বিশ্বকাপ, আর তার সাথে টানটান উত্তেজনা, রাত জেগে খেলা দেখা। আমাদের নিজেদের দেশ বিশ্বকাপে না খেললেও ফুটবল নিয়ে মাতামাতি একটুও কম হয় না। বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় মানুষ নিজেদের পছন্দের দেশের পতাকা ঝুলিয়েছে, মিষ্টির দোকানে পাওয়া গেছে বিভিন্ন দেশের পতাকা আর বিশ্বকাপের মত দেখতে মিষ্টি, এমনকি তারকা ফুটবলারদের ছবি আর মূর্তি দিয়ে হয়েছে বিশ্বকাপের পূজো।

FIFA WORLD CUP

আমেরিকাতে ইউরোপ বা দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের মত ফুটবলের অতটা জনপ্রিয়তা না থাকলেও সেখানকার মানুষও কিন্তু বিশ্বকাপের জ্বরের কবল থেকে রক্ষা পায়নি। বড় বড় শহরগুলোতে বিশেষ বিশেষ খেলার দিনগুলোতে লোকেরা নিজেদের পছন্দের দলের জার্সি পড়ে একসাথে জমায়েত হয়েছে বড় পর্দায় খেলা দেখার জন্য। এইরকম একটা আসরে যেখানে খেলা নিয়ে এতটা মাতামাতি, সেখানে কি কাউকে সমর্থন না করে চুপচাপ বসে খেলা দেখা যায়? তাই সকলেরই থাকে একটা করে পছন্দের

দল। তুমিও নিশ্চয়ই অন্যদের সাথে খেলা দেখতে দেখতে ভালবেসে ফেলেছ কয়েকটা দল আর কয়েকজন খেলোয়াড়ের খেলা। যখন বড় হবে, তখন দেখবে এই বয়সে ভাল লেগে যাওয়া দলগুলোর প্রতিই সারাজীবন কেমন একটা অন্ধ সমর্থন থেকে যায়। আমিও সেই ছোটবেলায় যেবার প্রথম বিশ্বকাপ দেখলাম ১৯৯০-তে, তখন থেকে সমর্থন করা শুরু করি জার্মানীকে, আর তখন থেকে ওদেরকেই সমর্থন করে আসছি। সেই বছর ওরা জিতেছিল। আশা করছিলাম এইবারও জিতবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশাপূরণ হল না আর মন খারাপ হয়ে গেল। যাক্, সে কথায় পরে আসছি।

এটা বললে মনে হয় খুব একটা ভুল হয়না যে ফুটবল বিশ্বকাপই একমাত্র খেলার আসর যা সারা পৃথিবীর মানুষকে একসাথে নিয়ে আসে। অলিম্পিকও হয়তো অনেকটা করে, কিন্তু সেখানে নানা ধরণের খেলার মধ্যে মানুষের আকর্ষণ ছড়িয়ে থাকে। অন্যদিকে প্রতি চার বছর অন্তর আয়োজিত বিশ্বকাপ ফুটবলে সব মানুষেরই মন পড়ে থাকে একটা খেলার উপর। তার মধ্যে তো আবার এইবারের বিশ্বকাপে ছিল অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য। ১৯৩০ সালে শুরু হওয়া এই ফুটবল উৎসবের ১৯তম আসর (মাঝে ২ বার আয়োজিত হয়নি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য) এই প্রথম আয়োজিত হল আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশে - দক্ষিণ আফ্রিকায়। তাই খেলার সাথে সাথে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক জড়িয়ে ছিল। আফ্রিকার অনেক দেশই এখনও রাজনৈতিক অস্থিরতা আর দারিদ্র্যের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। সেসব দেশে অনেক ক্ষেত্রেই ফুটবলই সবচেয়ে কার্যকরী শান্তির দূত হিসেবে মানুষের কাছে আসতে পেরেছে। এর ফলে কিছুদিন আগে আফ্রিকা মহাদেশে শান্তি আর নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানোর জন্য যে রাষ্ট্রদূতেদের নিযুক্ত করা হল তার মধ্যে ছিলেন আবেদি পেলে আর মাইকেল এসিয়েনের মত ফুটবলারেরা। আরো একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ হল আইভরি কোষ্ট। বহুদিন ধরে চলতে থাকা এই দেশের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ থামানোর আবেদনে টেলিভিশনের পর্দায় এসেছেন তাদের দেশের ফুটবল তারকা দিদিয়ের দ্রোগবা, আর তার ফলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। ১৯৭৮ সালের পর এই প্রথম খেলা আয়োজিত হল দক্ষিণ গোলার্ধে - সেবারে হয়েছিল আর্জেন্টিনায় আর এবারে দক্ষিণ আফ্রিকায়। বছরের এই সময়টাতে দক্ষিণ গোলার্ধে শীতের মরসুম চলে আর তার ফলে খেলোয়াড়দের পরিশ্রমও কম হয়। যে দশটি শহরে খেলা হল তার মধ্যে আবার বেশ কয়েকটির উচ্চতা বেশ বেশী - যেটাও আগের বিশ্বকাপগুলোতে হয়নি। এবারে খেলা হল নতুন এক ধরণের বল দিয়ে - তার নাম 'জাবুলানি'। এই অপেক্ষাকৃত হালকা বল যেমন নিয়ন্ত্রণ করা একটু কঠিন, তার সাথে এর গতিপথ মাঠের উচ্চতার উপরেও নির্ভর করে।

*ভুভুজেলা*

সব শেষে যেটা নিশ্চয়ই তোমার কান এড়িয়ে যায়নি সেটা হল 'ভুভুজেলা'র আওয়াজ। দক্ষিণ আফ্রিকার এই বিশেষ ধরণের বাঁশি এবারের বিশ্বকাপে ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। অনেকগুলো যখন একসাথে বাজে তখন শুনলে মনে হয়, হাজার হাজার মৌমাছি একসাথে জমায়েত হয়েছে। শুরুতে অনেক দল আর দর্শক প্রতিবাদ জানিয়েছে যে এই জন্য তাদের খেলায় মনোনিবেশ করতে অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে 'ফিফা' (ফেডারেশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন) 'ভুভুজেলা'র ব্যবহারে কোনরকম বাধানিষেধ আনেনি। আর যত দিন গড়িয়েছে, তত আফ্রিকার মানুষের সাথে পাল্লা রেখে অন্যান্য দেশের মানুষও এই বাঁশি বাজিয়েছে মাঠে খেলা দেখার সময়।

এবারের বিশ্বকাপের থিম সং ছিল কলম্বিয়ার গায়িকা শাকিরা'র গাওয়া 'ওয়াকা ওয়াকা'। শাকিরার সাথে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যান্ড 'ফ্রেশলিগ্রাউন্ড'। এই গানটির মূল সংস্করণটি যদিও ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য, কিন্তু বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষে গানটিতে কিছু পরিবর্তন আনা হয় ফুটবল আর আফ্রিকার কথা মাথায় রেখে। এক্ষেত্রে গানটির মূল বক্তব্য ছিল খেলার মাঠে যোদ্ধাদের, অর্থাৎ ফুটবলারদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য। এই গানটার সাথে সাথে তুমি নিশ্চয়ই 'ওয়েভিং ফ্ল্যাগ' গানটিও শুনে থাকবে। এই গানটি জন্মসূত্রে সোমালিয়ার, আর কানাডার অধিবাসী ক'নান-এর গাওয়া। এটি ছিল বিশ্বকাপ উপলক্ষে কোকা কোলা কোম্পানীর থিম সং। এই গানটির মধ্যে আছে অদ্ভুত এক জীবনীশক্তি। এর সাথে জড়িয়ে আছে ক'নান-এর আফ্রিকায় কাটানো ছোটবেলার অনেক স্মৃতি, আর তাই এই গানটিও জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল মানুষের মধ্যে।

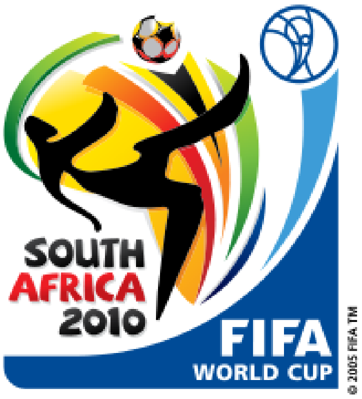

*২০১০ বিশ্বকাপের লোগো*

এবারের বিশ্বকাপের লোগোটির মধ্যে দেখা যায় বিভিন্ন রঙের পটভূমিকার সামনে এক কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ 'বাইসাইকেল কিক' করছে একটি ফুটবলে। তোমার নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করেছে যে এর মধ্যে কি অর্থ লুকিয়ে আছে। আসলে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণময় সংস্কৃতির জন্য দেশটিকে বলা হয় রামধনুর দেশ। এর প্রতিফলন ওদের নানা রঙের পতাকার মধ্যেও দেখা যায়, আর তার জন্যেই ওই বর্ণময় পটভূমিকা। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষটিকে রাখা হয়েছে আফ্রিকার মানুষের প্রতীক হিসেবে। আর 'বাইসাইকেল কিক' - যেটা খুবই দৃষ্টিনন্দন - আফ্রিকার মানুষের ফুটবল নিয়ে ভালবাসা, উদ্দীপনা আর আবেগের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে।

স্যাটেলাইট টেলিভিশনের দৌলতে এখন বিশ্বের অনেক তারকা ফুটবলারের নাম আর খেলার ধরণ এখন

মানুষের নখদর্পণে। বিশ্বের ৬টি মহাদেশ থেকে মোট ২০৫টি দেশ ২ বছরের বেশী সময় ধরে যোগ্যতা অর্জনকারী পর্যায়ের ম্যাচ খেলে শেষ পর্যন্ত ৩২টি দেশ অর্জন করেছিল বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার ছাড়পত্র। এদেরকে ভাগ করা হল ৮টি গ্রুপে। নিজেদের মধ্যে ম্যাচ খেলে প্রতি গ্রুপের প্রথম দুটি করে দল দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ অর্জন করল আর তার পর চলতে থাকল নক্‌-আউট রাউন্ড। প্রথম পর্যায় থেকে বিদায় নিয়ে অনেককেই হতাশ করল ২০০৬-এর চ্যাম্পিয়ন আর রানার-আপ ইতালি আর ফ্রান্স। অন্যদিকে প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করা নিউজিল্যান্ড একটিও ম্যাচ না হেরে সবাইকে অবাক করে দিল। যদিও নিজেদের গ্রুপে তৃতীয় হওয়ার কারণে তাদের প্রথম পর্যায় থেকেই বিদায় নিতে হল। দ্বিতীয় পর্যায়ের ১৬টি দেশের মধ্যে ৮টি গেল কোয়ার্টার ফাইনালে। এদের মধ্যে যেমন ছিল জার্মানী, ব্রাজিল, হল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, স্পেনের মত টুর্নামেন্টের জনপ্রিয় দলগুলি, তার সাথে ছিল কম আলোচিত আর সকলকে তাক লাগিয়ে দেওয়া উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, আর ঘানা। আফ্রিকা মহাদেশের বাকি দলগুলো প্রথম পর্যায় থেকে বিদায় নেওয়ার ফলে ঘানার এই দলটির উপরেই ছিল গোটা মহাদেশের আশা-ভরসা।

কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ব্রাজিল হেরে গেল হল্যান্ডের কাছে। তারকাখচিত আর্জেন্টিনাকে চূর্ণ করে জার্মানীর তরুণ দলটি, যাদের অনেকের বয়সই ২০-২১, তারা জিতল ৪-০ গোলে। টানটান উত্তেজনার ম্যাচে স্পেন হারাল প্যারাগুয়েকে ১-০ গোলে। উরুগুয়ের সাথে এক্স্‌ট্রা টাইমের শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি মিস্‌ করে টাইব্রেকারে হেরে গেল ঘানা। কিন্তু আফ্রিকা মহাদেশে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্য দাবী করার সাথে সাথে পৃথিবীর অনেক মানুষের মন জয় করল এই তরুণ দলটি। সেমিফাইনাল ম্যাচে হল্যান্ড জিতল ৩-২ গোলে উরুগুয়ের সাথে আর স্পেন জিতল ১-০ গোলে জার্মানীর সাথে। এর ফলে ফুটবল ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য স্পেন খেলল বিশ্বকাপ ফাইনাল। অন্যদিকে হল্যান্ড এর আগে দুইবার, ১৯৭৪ এবং ১৯৭৮, ফাইনালে খেললেও দুইবারই ফিরতে হয়েছে রানার-আপ হয়ে। জার্মানী হেরে যাওয়ার পরে খুব খারাপ লেগেছিল, আর খেলা দেখতেই ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু তারপরে মনে হল যে স্পেন আর হল্যান্ড দলেও তো ভাল ফুটবলারেরা আছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে তো আমার খুব ভাল লাগে। জার্মানী না হয় আরেকবার জিতবে, কিন্তু তার জন্য মন খারাপ করে কি বাকি ম্যাচগুলো থেকে বঞ্চিত হওয়া যায়? তাই আর বেশী মন খারাপ করলাম না। তৃতীয় স্থান-নির্ধারক খেলায় জার্মানী হারাল উরুগুয়েকে ৩-২ গোলে। গোটা টুর্নামেন্টে তাদের চিত্তাকর্ষক ফুটবল মানুষের অনেকদিন মনে থাকবে।

*স্পেনের দল*

ফাইনাল খেলায় দুই দলই খানিকটা রক্ষণাত্বক পদ্ধতি অবলম্বন করায় খেলাটি খুব একটা আকর্ষক হলনা। এক্সট্রা টাইমের শেষের দিকে ইনিয়েস্তার দেওয়া একমাত্র গোলে স্পেন হল প্রথমবারের জন্য বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন। দারুণ খেলে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কার সোনার বল জিতে নিল উরুগুয়ের দিয়েগো ফোরলান।

*দিয়েগো ফোরলান*

শ্রেষ্ঠ তরুণ খেলোয়াড় নির্বাচিত হওয়ার পাশাপাশি সবচেয়ে বেশী ৫টি গোল করে সোনার বুট জিতে নিল জার্মানীর একুশ বছরের থমাস মুলার।

*থমাস মূলার*

ভিয়া, স্নাইডার আর ফোরলান সমসংখ্যক গোল করলেও মুলার পুরষ্কারটি পেল এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গোলের সুযোগ তৈরী করার সুবাদে। অনেক তারকা ফুটবলার আশানুরূপ ভাল না খেললেও ফুটবলপ্রেমীদের মনে দাগ কেটে গেল স্পেনের ভিয়া, ইনিয়েস্তা, জার্মানীর ওজিল, মুলার, সোয়েনস্টাইগার, হল্যান্ডের স্নাইডার, রবেন, উরুগুয়ের ফোরলান, সুয়ারেজ, ঘানার আসামোয়া জিয়ান,

আর্জেন্টিনার মেসি, ব্রাজিলের মাইকন, লুই ফাবিয়ানো এবং আরো অনেকে।

*স্পেনের ভিয়া*

*হল্যান্ডের স্নাইডার*

© AFP/Getty Images

*জার্মানীর ওজিল*

ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার মত দলগুলো তাড়াতাড়ি বিদায় নেওয়ার ফলে আশাহত হয়েছে অনেক মানুষ। কিন্তু তার সাথে সাথে নতুন নায়কদেরও বরণ করে নিয়েছে।

আর এক মাসের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে বিভিন্ন দেশের ক্লাব ফুটবল, অংশ নেবে এই তারকারা। মানুষ মুগ্ধ হয়ে দেখবে তাদের খেলা আর শুরু হবে অপেক্ষা পরবর্তী বিশ্বকাপের – যা আয়োজিত হবে ২০১৪ সালে ব্রাজিলে। তুমিও নিশ্চয়ই এখন থেকে তার জন্য অপেক্ষা করা শুরু করে দিয়েছ।

পাভেল ঘোষ
টেম্পি, অ্যারিজোনা

# আঁকিবুকি

ইচ্ছামতীর বর্ষা সংখ্যায় এবারে অনেকগুলি ছবি পাঠিয়েছে ইচ্ছামতীর নতুন বন্ধুরা। কেমন লাগল জানিও কিন্তু আমাদের।

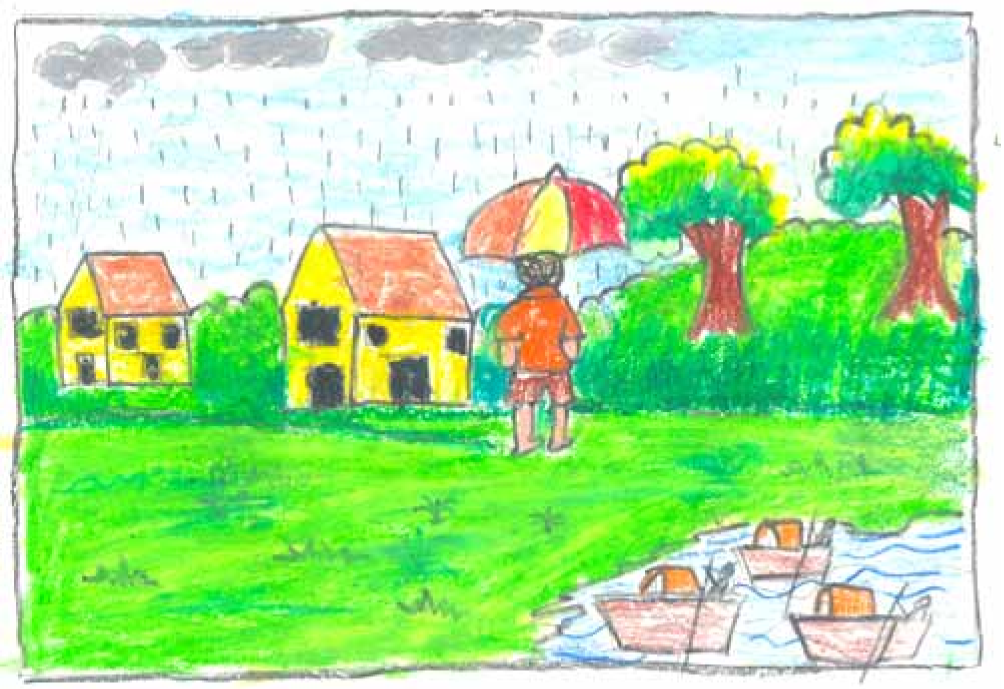

*শুভম গোস্বামী, দ্বিতীয় শ্রেণী,ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল, কলকাতা*

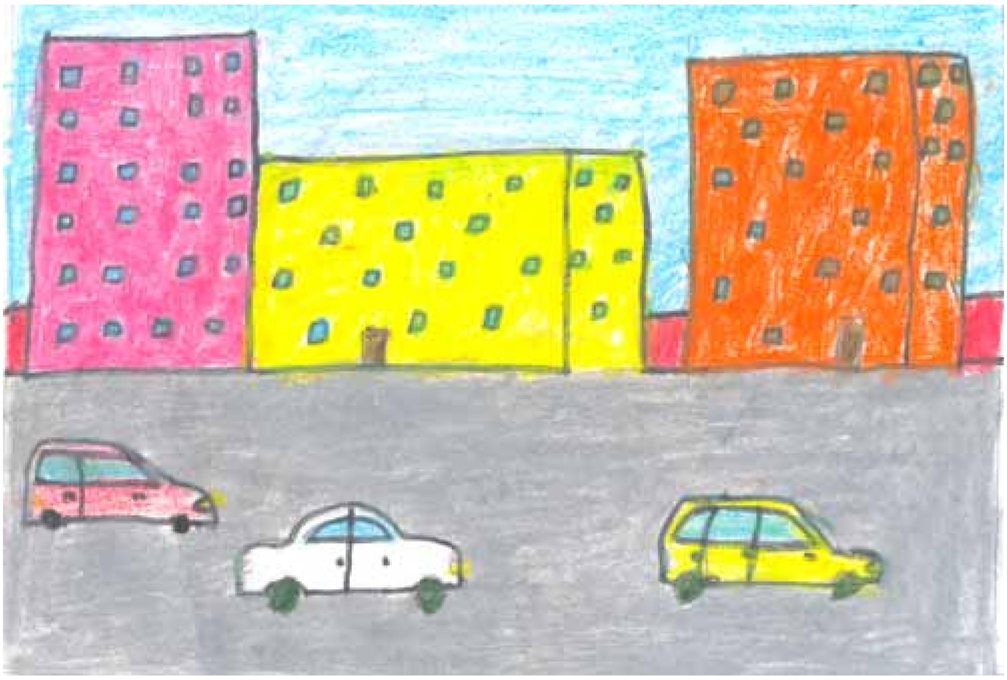

*অর্কপ্রভ বসু, পঞ্চম শ্রেণী, পাঠ ভবন*

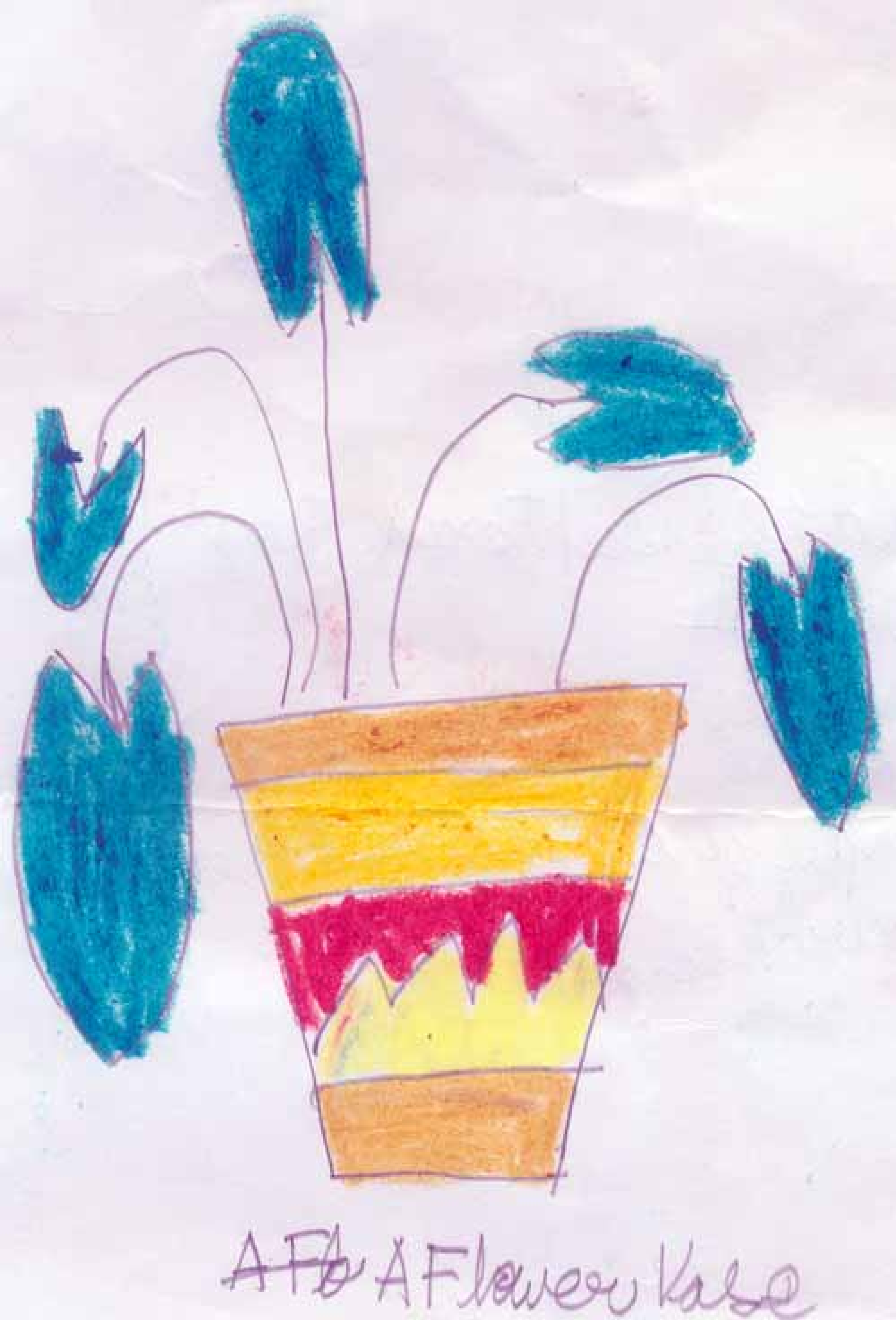
~~A Flo~~ A Flower Vase

দীপ্তারুণ রায়, তৃতীয় শ্রেণী,দ্য অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চ স্কুল, কলকাতা

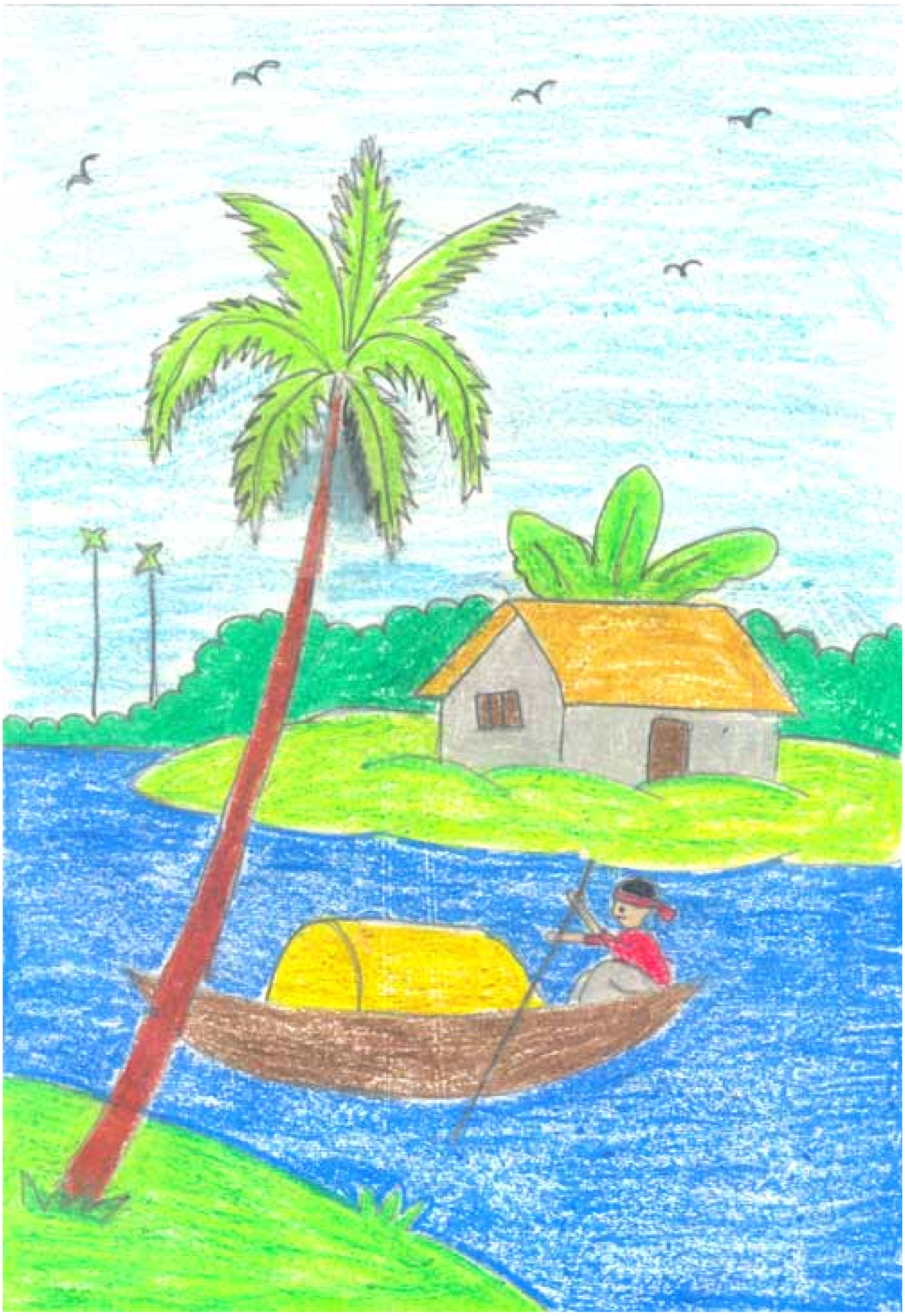

সুদীপা কুজুর, তৃতীয় শ্রেণী, বি ডি মেমোরিয়াল ইন্সটিট্যুট, কলকাতা

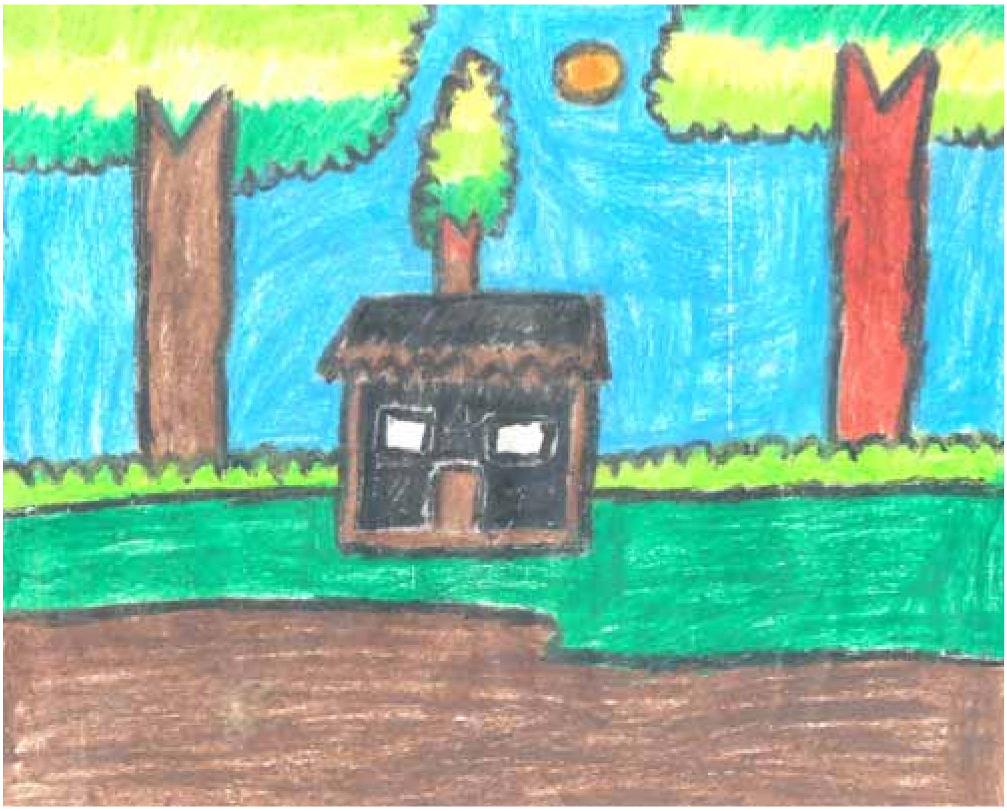

*বিনীতা মজুমদার, তৃতীয় শ্রেণী, ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল*

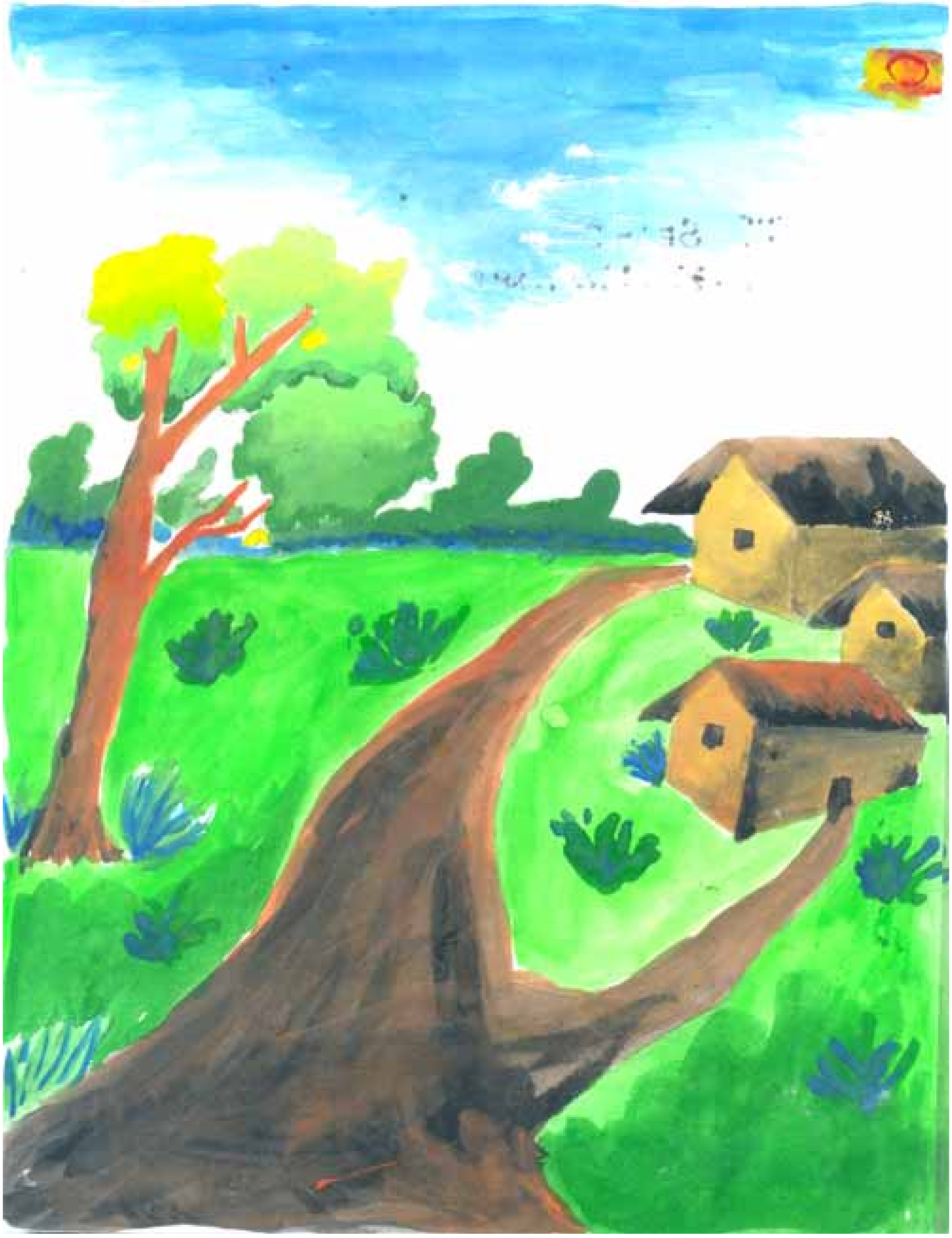

আরাত্রিক রায়,চতুর্থ শ্রেণী,বি ডি মেমোরিয়াল ইন্সটিট্যুট, কলকাতা

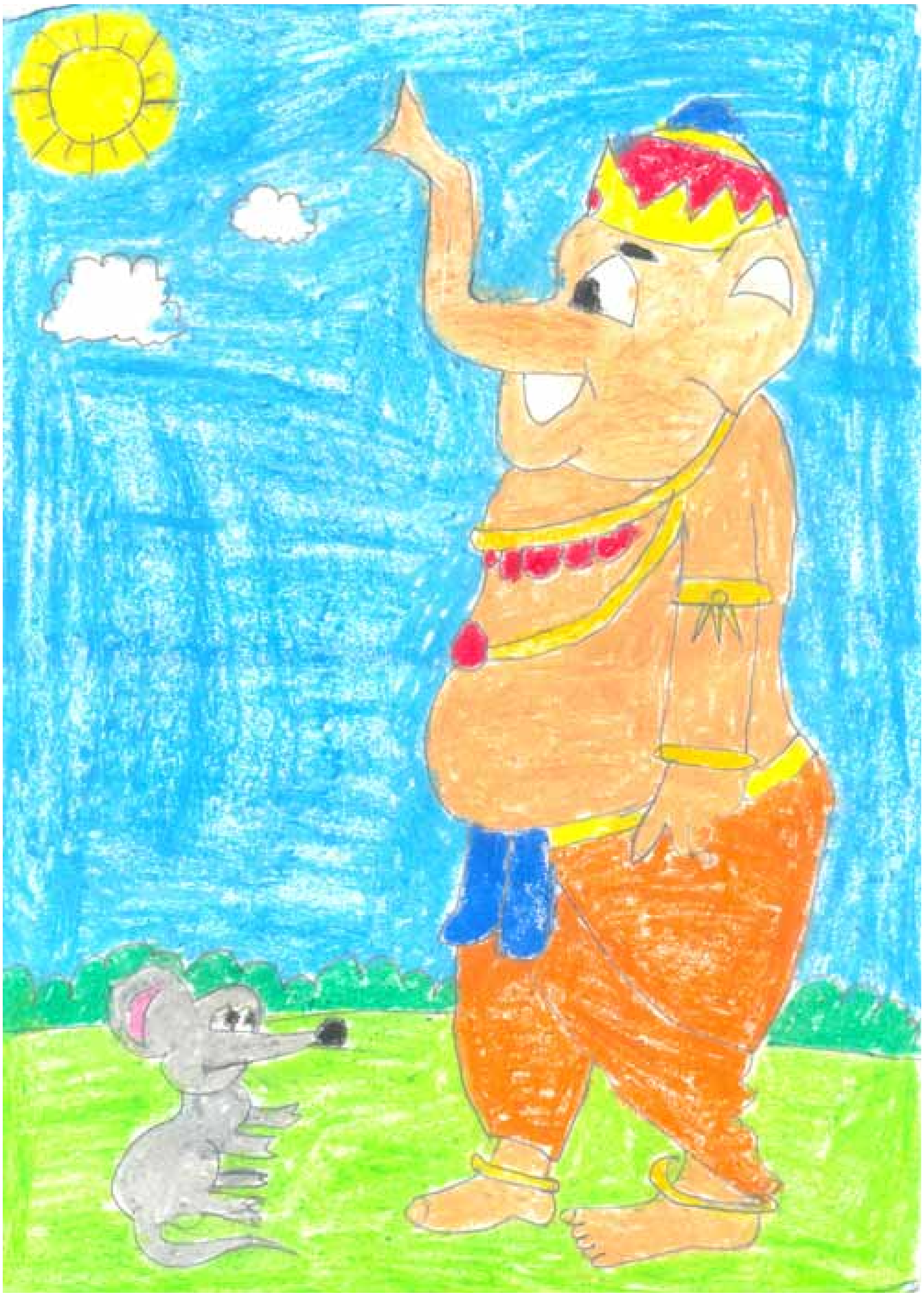

*সুপ্রতীক হালদার, সপ্তম শ্রেণী, বি ডি মেমোরিয়াল ইন্সটিট্যুট, কলকাতা*

তুমিও কি ইচ্ছামতীর কাছে তোমার আঁকা ছবি পাঠাতে চাও? তাহলে আগামি সংখ্যার জন্য তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও আমাদের ইমেল ঠিকানায়।